দুনিয়ার ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

স্নেহের দীপান্বিতাকে

দিলাম

মেসোমশাই

দাম

সূচীপত্র

দুনিয়ার ঘনাদা

লাল না সবুজ ?

সবুজ কোথায় ? ফিকে গোলাপী পর্যন্ত নয়। একেবারে খুন-খারাপি ঘোর লাল যে এখন !

হ্যাঁ, শুধু লাল আর সবুজ নিয়েই আছি ক'দিন ধরে। মাঝখানে হলদে টলদে নেই। আমাদের এখানে হয় এস্পার নয় ওস্পার। হয় ধনধান্য পুষ্পে ভরা, নয়—ধু-ধু বালির চড়া।

বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের কথা যে বলছি তা যাঁরা বুঝেছেন লাল সবুজের মানে বুঝতেও তাঁদের নিশ্চয় বাকি নেই।

হ্যাঁ, লাল সবুজ হল সিগ্‌ন্যাল। রুখব না এগোব তারই নিশানা।

হলদের মত মাঝামাঝি ন যযৌ ন তস্থৌ দোনামনা রঙের বালাই আমাদের নেই। লাল আর সবুজ নিয়েই আমাদের কারবার।

গোড়া থেকে লালই চলছিল। আমাদের অবস্থাও অতি করুণ। দোতলার আড্ডা-ঘরে জমায়েৎ হই, কিন্তু আসর জমে না। হতাশ নয়নে টঙের ঘরের সিঁড়িটার দিকে তাকাই, কিন্তু ওই পর্যন্তই। ও সিঁড়িতে আমাদের পা বাড়ানো নৈব নৈব চ। লাল সিগ্ন্যাল অমান্য যদি করো ত দুর্ঘটনা। গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে শিবু যা বাধিয়েছে! সেই থেকেই ঘোর লাল চলছে।

কিসের এত ভয়! – শিবু মরিয়া হয়ে একদিন বলেছিল, – আমরা সব মেনে নিই বলে উনিও জো পেয়ে যান। এতদিন গেঁজলাতে না পেরে পেট ফুলে ঢাক হয়ে গেছে এদিকে। আমি গিয়ে খুঁচিয়ে মুখ খোলালে বর্তে যাবেন। তোরা দেখ না, পনেরো মিনিট বাদেই তোদের ডাকছি। আমার আওয়াজ পেলেই সব ওপরে চলে আসবি।

পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হয়নি।

পাঁচ মিনিট না-হতেই আওয়াজ পেয়েছি। তবে শিবুর গলার নয়, তার পায়ের।

শিবু চটপট সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

না, ভয়ে মুখ শুকনো টুকনো নয়, কিন্তু লজ্জায় যেন কালি মেড়ে দেওয়া।

কি হল কি? – গৌর জিজ্ঞাসা করেছে, – আমাদের না ডেকে নিজেই নেমে এলি যে!

গৌরের সরল প্রশ্নের আড়ালে সামান্য একটু ঠাট্টার খোঁচা হয়ত ছিল কিন্তু সেটা অত তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠার মত কিছু নয়।

হ্যাঁ, এলাম! – শিবুর ক্ষুব্ধ চাপা গুমরানি শোনা গেছে – আমায় কি বলেছেন জানো?

শিবুর কাছে নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ তারপর পাওয়া গেছে।

শিবু রীতিমত হৈ চৈ করে টঙের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল! যেন

মাঝখানে কোথাও কোনো সুতো ছেঁড়েনি। 'ইয়ালটা' সম্মেলনের গলাগলিই চলছে, 'নাটো'-র নামই জানা নেই।

আরে কি খবরের কাগজ পড়ছেন অবেলায় বসে বসে!—শিবু খবরের কাগজটা প্রায় টেনে নিতেই গেছে—নিচে চলুন। সবাই বসে আছে হাপিত্যেশ করে। আর একটু জোরে নিঃশ্বাস টানুন না। গন্ধ পাবেন। ফ্রায়েড্ প্রন্ তো নয়, যেন মুনি ঋষির প্রতিজ্ঞা ভাঙা প্রলোভন!

যাঁর উদ্দেশ্যে এই বাগ্‌বিস্তার তিনি কি কালা বোবা হবার ভান করেছেন?

না। পেন্সিল হাতে নিয়ে খবরের কাগজটার যে পাতায় তিনি দাগ দিচ্ছিলেন সেটা শিবুর প্রায় কোলের ওপরেই যেন নিজের অজান্তে সরিয়ে রেখে তিনি গম্ভীরভাবে শিবুর দিকে চেয়ে বলেছেন. —আপানাদের ভাবনা করবার কিছু নেই। যাবার আগে এ ঘরের ভাড়া আমি চুকিয়ে দিয়ে যাব। দেখতেই তো পাচ্ছেন বাসা খুঁজছি।

দেখতে শিবু খুব ভালো রকমই তখন পেয়েছে। কাগজের বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপনের কলমে ঘনাদা তাঁর লাল পেন্সিলে মোটা মোটা করে দাগ মেরেছেন।

কিন্তু সে দাগবাজি বা তাঁর টঙের ঘরের ভাড়া মিটিয়ে দেবার আশ্বাসে যতটা নয়, তার চেয়ে 'তুমি' থেকে 'আপনি'র চূড়োয় আচমকা চালান হয়েই শিবুর তখন টলটলায়মান অবস্থা।

আমাদের সকলেরও তাই।

ঘনাদা আপনি বললেন তোকে?—শিশিরের চোখ-কপালে-তোলা প্রশ্ন।

তুই ঠিক শুনেছিস্?—আমার সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি। একবার নয় অন্ততঃ দশবার।—শিবু উত্তেজিতভাবে বলেছে,—শেষে হ্যাণ্ডনোটই না লিখে দেবার কথা বলেন, তাই পালিয়ে এসেছি।

হ্যাঁ, লাল নিশানা খুনখারাপির রাঙা চোখে পৌঁছোবার পর সেটাও অসম্ভব নয়।

খবরের কাগজের দাগরাজিই ছিল প্রথম লাল নিশানা।

ঘনাদা যে নিত্য নিয়মিতভাবে খবরের কাগজের 'টু-লেট' পংক্তি দাগাচ্ছেন, গোড়াতেই তা জানা গেছে। অজানা থাকবার জো কি!

ঘনাদার পড়া হয়ে যাবার পর কাগজগুলো আমাদের আড্ডা-ঘরেই এনে রাখা হয়। এখন আবার তাতে ভুল কি গাফিলি করবার উপায় নেই বনোয়ারীর। ঘনাদার জরুরী নির্দেশটা প্রতিদিন টঙের ছাদ থেকে বেশ জোরালো গলাতেই ঘোষিত হয়।

আরে বনোয়ারী কোথায় গেলি! কাগজগুলো নিয়ে যা। শেষে কাগজগুলোর ওপর মৌরসী পাট্টার দায়ে না পড়ি!

এ ঘোষণাটা সকালে দুপুরে নয়, ঠিক বিকেল বেলা আড্ডা ঘরে আমরা এসে জমায়েৎ হবার পরই শোনা যায়।

বনোয়ারীর যেটুকু দেরী হয় কাগজ নামিয়ে আনতে আমাদের সেটুকু সবুরও যেন সইতে চায় না। কাগজ এলেই একটি বিশেষ পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি।

বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হয় না। ঘনাদার লাল পেন্সিলের দাগ সূক্ষ্ম-টূক্ষ্ম তো নয়, একেবারে লাঙ্গলের ফলা দিয়ে যেন টানা।

কি রকম বাসা ঘনাদা খুঁজছেন তার একটু নমুনা দাগমারা 'টু-লেট'-এর বিজ্ঞাপন থেকে অবশ্য পাই।

ঘনাদার বড় খাঁই-টাই নেই। চাহিদা তাঁর যৎসামান্য। মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই হলেই তিনি যে খুশী দাগানো বিজ্ঞাপন পড়লেই তা বোঝা যায়।

"এক বিঘা জমিতে বাগান ঘেরা একটি ত্রিতল হাল ফ্যাশানের বাড়ি। আগাগোড়া মোজেইক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত উপরে নিচে চারিটি শয়নকক্ষ। আচ্ছাদিত বারান্দা। গ্যারেজ ও অনুচরদিগের পৃথক ব্যবস্থা। ভাড়া মাসিক বারোশত টাকা।"

কিংবা।

"নবনির্মিত বিশ তলা টাওয়ার বিল্ডিংসের উপর তলার দুইটি সংযুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যথোচিত আনুষঙ্গিক সহ তিনটি করিয়া শয়নকক্ষের ফ্ল্যাট। একটি স্বয়ংক্রিয় ও আরেকটি অনুচর চালিত লিফ্‌ট।"

এর বেশী উঁচু নজর ঘনাদার নেই।

প্রতিদিন এ লাল পেন্সিলে দাগানো বিজ্ঞাপন তো পড়তেই হচ্ছে। তার ওপর দুবেলা বড় বড় দুটি টিফিন-কেরিয়ারের সঙ্গে থালা বাটি গেলাসের ঝোলা আর জলের জ্যাগ বয়ে নিয়ে যাওয়ার মিছিল দেখেও ধৈর্য ধরে ছিলাম। কিন্তু শিবুর সঙ্গে আমাদের হঠাৎ 'আপনি' হয়ে ওঠাটা ভাবনা ধরিয়ে দিলে। রামভুজের কাছে গোপনে খবরটা তাই নিতে হল।

বড়বাবুর সেবা ঠিক হচ্ছে তো রামভুজ?

জি, হ্যাঁ। – রামভুজ জোর গলায় জানালে।

টিফিন-কেরিয়ার দুটো দুবেলা ঠিক মত ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তো?

রামভুজ সে বিষয়েও আশ্বস্ত করলে। টিফিন-কেরিয়ার বোঝাই করে পাঠাবার ব্যাপারে কোন ত্রুটি নেই। নিত্য নূতন পদ সে নিজে হাতে রেঁধে টিফিন-কেরিয়ারে ভরে বনোয়ারীকে দিয়ে পাঠাচ্ছে। টিফিন-কেরিয়ার দুটোয় অরুচির প্রমাণও পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত। চাঁছা-পোঁছা হয়েই তো ফিরে আসছে প্রতিদিন!

তাহলে উপায়?

উপায় ভাববার আগে টিফিন-কেরিয়ারের রহস্যের একটু ব্যাখ্যা বোধহয় প্রয়োজন।

ঘনাদা বেশ কিছুদিন থেকে খবরের কাগজের 'টু-লেট' কলমে দাগ মেরে শুধু বাসা-ই খুঁজছেন না, আমাদের বাহাত্তর নম্বরের অন্ন-জলও ত্যাগ করেছেন।

তাই তাঁর জন্যে আজকাল একটা নয় দু-দুটো টিফিন-কেরিয়ারে দুবেলা খাবার যায় তাঁর টঙের ঘরে। সে খাবার নিয়ে যায় অবশ্য রামভুজ আর বনোয়ারী। বাহাত্তর নম্বরের ওপর ওইটুকু দয়া তিনি

এখনো রেখেছেন। রামভুজকেই বাইরে থেকে তাঁর খাবার আনবার গৌরবটুকু তিনি দিয়েছেন।

প্রথম দিনই রামভুজকে বাধিত হবার এই দুর্লভ সুযোগ দিয়ে তিনি বলেছিলেন,—তোমাদের এখানে ভালো হোটেল-টোটেল আছে রামভুজ ?

রামভুজ তখন আমাদেরই পরামর্শে ঘনাদা নিচে না ওপরে তাঁর ঘরে বসেই পাবেন সে কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছে।

ঘনাদার উক্তির গভীর তাৎপর্য না বুঝে তাচ্ছিল্যভরে জানিয়েছে যে, হোটেলে থাকবে না কেন ? অনেক আছে। কিন্তু তাকে কি আর হোটেল বলে !

হঠাৎ একটু টনক নড়ে ওঠায় উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে— হোটেল কি হোবে বড়াবাবু ?

কি আর হবে !—ঘনাদা যেন নিরুপায় হয়ে বলেছেন,—ভালো হোটেল থাকলে সেখান থেকেই খাবারটা আনাতাম। তা যখন নেই বলছ তখন গ্র্যাণ্ড কি গ্রেট ইষ্টার্ণেই যেতে হবে।

গ্র্যাণ্ড, গ্রেট ইষ্টার্ণ রামভুজ বোঝেনি। কিন্তু হোটেল থেকে খাবার আনাবার কথাতেই শঙ্কিত হয়েছে।

আপনি হোটেল কেনো যাবেন বড়াবাবু—শশব্যস্ত হয়ে বলেছে রামভুজ,—আপনার খানা তো হামি ইখানেই লায়ে দিচ্ছি।

ঘনাদা রামভুজের দিকে স্নেহ ভরেই তাকিয়েছেন এবার।

তা তুমি আনতে পারো রামভুজ, কিন্তু এখানকার কিছু নয়। এখানে আমি আর খাব না।

খাইবেন না ইখানে !—মুখটা পুরোপুরি হাঁ হয়ে যাবার আগে ওইটুকু বলতে পেরেছে রামভুজ।

উত্তর দেওয়াও বাহুল্য মনে করে ঘনাদা শুধু মাথা নেড়েছেন দুবার !

ঘনাদার এ চরম ঘোষণার পর প্রায় বিহ্বল অবস্থায় নেমে এসে রামভুজ আমাদের সব জানিয়েছে।

একটা কিছু ধাক্কার জন্যে আমরা প্রস্তুতই ছিলাম! কিন্তু সেটা এমন উৎকট হবে ভাবতে পারি নি।

আমাদের অমন মুহ্যমান দেখে হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করেছে রামভুজ—হামি এখোন কি কোরবে! হামাকে খানা তো বাহারসে লাৎে বোলিয়েছেন।

লাতে বোলেছেন তো লাও,—শিবু হঠাৎ চটে উঠেছে, খাবার লাতে তো বোলেছেন, পয়সা দিয়েছেন?

পয়সা উনি আগে দেবেন!—শিশিরই ঘনাদার মান বাঁচাতে রুখে দাঁড়িয়েছে, উনি কি তোমার আমার মত হেঁজি পেঁজি যে নগদা দামে সওদা করেন! যত ওপরে তত সব ধারে কারবার। মার্কিন মুলুক হলে ওর ক্রেডিট কার্ড থাকত তা জানো! শুধু একটু পাঞ্চ করিয়েই যেখানে যা প্রাণ চায় নিতেন।

হ্যাঁ, সেই ভুলই করেছেন নিশ্চয়।—গৌর শিশিরকে ঠোকা দিয়েছে, বনমালী নস্কর লেনটা ভেবেছেন ফিফ্থ্ অ্যাভেন্যু।

এর পর ঘনাদার ভুলটা আমাদেরই সামলাতে হচ্ছে তাঁর ক্রেডিট কার্ড-এর দায় নিয়ে।

তার জন্যে ঝামেলা বড় কম নয়। একটা নয় দু-দুটো টিফিন-কেরিয়ার আনতে হয়েছে কিনে। থালা-বাটি গেলাসগুলো অবশ্য আমাদের বাহাত্তর নম্বরেরই। ঘনাদা সেগুলো চিনতে পারেন নি বা মাপ করে যাচ্ছেন।

তা মাপ করবার জন্যে পূজোও চড়াতে হচ্ছে কি কম! দুটি টিফিন-কেরিয়ার ভর্তি নৈবিদ্যি দুবেলা পাঠাতে হচ্ছে আমাদের ওই বাহাত্তর নম্বরের হেঁসেলেই রান্না করে।

সে রান্নার গন্ধ তাঁর টঙের ঘর থেকেই ঘনাদার পাবার কথা, কিন্তু নাকের সে কাজটা তিনি আপাততঃ মুলতুবি রেখেছেন বোধহয়। রামভুজ আর বনোয়ারী তাঁর খাবার নিয়ে যাবার পরে মাঝে মাঝে তিনি শুধু একটু তারিফ করে তাদের কৃতার্থ করেন।

হোটেলটা তো ভালোই খুঁজে বার করেছ রামভুজ! রান্নাটাও তো বেশ সরেস মনে হচ্ছে! হোটেলটা কোথায়?

এই নিচে বড়াবাবু, রামভুজ লজ্জিত হয়ে বলে,—এই নিচেই আছে!

ঘনাদা ওইটুকুর বেশি আর খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না, এই বাঁচোয়া।

কিন্তু এমন করেই বা চলবে কতদিন! ছুঁচ হয়ে শুরু হয়ে ব্যাপারটা সত্যিই যে ফাল হতে চলেছে! অথচ লাল পেন্সিলে 'টু-লেট' বিজ্ঞাপন দাগানো আর বাহাত্তর নম্বরের পৃথগান্ন হওয়ার ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল অতি সামান্য ছুতো থেকে।

দোষটা অবশ্য শিবুর। ঘনাদা না হয় পাতে দু-দুটো প্রমাণ বাটামাছ ভাজা নিয়েও একটু চিপ্‌টেন কেটেছিলেন—বাটা মাছ এনেছ হে! এ যে বড় কাঁটা!

তাই বলে পরের দিন ওই শোধটুকু না নিলে চলত না!

শিবুই আজকাল আমাদের পার্মানেন্ট মার্কেটিং অফিসার। ঘনাদাকে কচি মুলো খাওয়াবার সেই কেলেঙ্কারির পর মনে মনে তার বোধহয় একটু জ্বালাই ছিল। বাজারের সেরা বাছাই করা বাটার নিন্দায় সেটা আরো চাগিয়ে উঠেছে।

পরের দিন কি একটা ছুটির তারিখ। দুপুর বেলা বেশ একটু জমিয়ে খেতে বসে ঘনাদাকে ঘন ঘন আমাদের সকলের থালাগুলোর ওপর চোখ বোলাতে দেখে একটু অবাক হয়েছি। আমাদের নজরও তখন গেছে ঘনাদার পাতে।

সত্যিই তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমাদের সকলের পাতে বড় বড় জোড়া কই আর ঘনাদার পাতে কি ও দুটো! আরে! ও তো বেলেমাছ! আমাদের কই আর ঘনাদার বেলে!!

ঠাকুর!—আমরাই ঘনাদার আগে ডাক দিয়েছি।

কাঁচুমাচু মুখ করে রামভুজ এসে দাঁড়াতেই বুঝেছি ব্যাপারটা নেহাৎ দৈবদুর্ঘটনা নয়।

ঘনাদার পাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করেছি সবিস্ময়ে,—ঘনাদার পাতে বেলে মাছ কেন ?

রামভুজকে জবাব দিতে হয়নি। এতক্ষণ মাথা নিচু করে যে কই মাছের কাঁটা বাছছিল সেই শিবু মুখ তুলে চেয়ে এ-রহস্যে আলোকপাত করেছে।

সহজ সরল গলায় বলেছে,—বেলে মাছ আমি দিতে বলেছি।

তুমি দিতে বলেছ!—আমরা হতভম্ব,—আমাদের বেলা কই আর ঘনাদার বেলা বেলে!

হ্যাঁ,—শিবু যেন আমাদের এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়িতেই অবাক—অন্যায়টা কি হয়েছে তাতে! ঘনাদার কাঁটাতে ভয়, তাই ওঁর জন্যে আলাদা মোলায়েম মাছ এনেছি।

আমরা স্তম্ভিত নির্বাক।

নিস্তব্ধ ঘরে শুধু একটা 'হুঁ' শোনা গেছে।

না, মেঘের চাপা গর্জন নয়, ঘনাদা তাঁর নিজস্ব মন্তব্য ওই ধ্বনিটুকুতে প্রকাশ করেছেন।

তার পর পাত ফেলে উঠে গেছেন কি? না, তা ঠিক যাননি, তবে এক মুহূর্তে আমরা যেন তাঁর কাছে হাওয়া হয়ে গেছি। আমাদের সাধ্যসাধনা মিনতি যেন তাঁর কানেই পৌঁছোয়নি।

খাওয়া শেষ করে ঘনাদা ওপরে উঠে গেছেন। আমরা শিবুকে নিয়ে পড়ে তাকে প্রায় ছিঁড়ে খেয়েছি। কিন্তু হাতের তীর ছুটে গেলে ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে খুঁড়ে আর লাভ কি! যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরবে না।

তবু অল্পে-স্বল্পে রেহাই পাবার আশায় বিকেল না-হতেই রামভুজকে টঙের ঘরে পাঠিয়েছিলাম। ফল যা হয়েছে তা তো জানা। সেই থেকেই টিফিন-কেরিয়ারে হোটেলের খানা আর কাগজ দাগানো লাল মানার দিন চলেছে।

কিন্তু একটা কোনো নিষ্পত্তি তো আর না হলে নয়।

মুস্কিলের যে মূল, আসানের ফিকিরটা তার মাথা থেকেই

বেরিয়েছে। হ্যাঁ শিবু-ই উপায়টা বাৎলেছে নেহাৎ রাগের ঝাঁঝটা প্রকাশ করতে গিয়ে।

লালের জবাব তো সবুজ! তাই দিতে হবে এবার।

সবুজ আবার কি জবাব?—আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

উনি লাল পেন্সিলে দাগাচ্ছেন।—শিবু ব্যাখ্যা করেছে—আমরা সবুজে দাগাব কাল থেকে!

কি দাগাব?

কি আবার! ওই বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন।—শিবু নিজের প্রস্তাবে নিজেই মেতে উঠে বুঝিয়ে দিয়েছে—আমরাও এ-বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে দিচ্ছি—তাই কাল সকালে প্রথমেই 'টু-লেট'-এর পাতায় সবুজ দাগ পড়বে।

শিবুর ওপর যত রাগই করি, ফন্দিটা তার নেহাৎ মন্দ নয়। অন্ততঃ ডুবতে বসে শেষ কুটো হিসেবে একবার ধরা যায়।

কিন্তু তাতেই অমন বাজিমাৎ হবে আমরাই কি ভাবতে পেরেছি!

সবুজ পেন্সিল আগেই যোগাড় করা ছিল। ভোরে উঠে একেবারে রাস্তায় গিয়েই কাগজওয়ালার হাত থেকে ইংরেজী, বাংলা দুটো কাগজই নিয়েছি। তারপর সবুজ দাগ মেরেছি খাবার ঘরেই বসে বসে।

দাগ মেরেছি খুব বিবেচনা করে মাত্র দুটি বিজ্ঞাপনে। ঘনাদার যেমন আমিরী নজর, আমাদের তেমনি ফকিরী। কোথায় দূরে শহরতলীর কোন্ এঁদো গলিতে সস্তা ভাড়ায় টালির ছাদের দুটো ঘর। দাগ মেরেছি তাতেই। দাগ মেরেছি তারও অধম এজমালি উঠোন বাথরুমের আর একটা ঘর ভাড়ার বিজ্ঞাপনে।

সকালের চায়ের ট্রের সঙ্গে—চা টাও অন্য হোটেলের বলেই ধরে নেন ঘনাদা—বনোয়ারী যথারীতি খবরের কাগজগুলো নিয়ে গিয়েছে টঙের ঘরে।

আমরা সবাই মিলে তখন বাহাত্তর নম্বর থেকেই হাওয়া। প্রতিক্রিয়াটা পরে রামভুজের মারফৎই জানতে পেরেছি।

সকালে কাগজ উল্টে ঘনাদার চোখ যদি একটু কপালে উঠে থাকে তার সাক্ষী কেউ নেই। কিন্তু দুপুরে টিফিন-কেরিয়ার বয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর পাত সাজাবার সময় রামভুজকে প্রথমে দু-একটা নেহাৎ যেন অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে।

নিচে যে আজ সব কেমন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে রামভুজ?

এমনি একটি ছুতো পাবার আশাতেই রামভুজকে ভোর থেকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা হয়েছে। সে আশা বিফল হয়নি। রামভুজও আমাদের শিক্ষার মান রেখেছে।

ঘনাদা কথাটা পাড়তে না পাড়তেই রামভুজ হতাশ মুখ করে জানিয়েছে যে তার আর বনোয়ারীর হয়রানির অন্ত নেই। বাবুরা সেই ভোর বেলা বেরিয়েছেন। কখন ফিরে আসবেন কে জানে! যতক্ষণ না আসেন তাদের এই হেঁসেল পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হবে।

তা ওঁরা গেছেন কোথায়!—এবার ঘনাদার প্রশ্নটা আর ঘোরালো নয়, গলাটাও তীক্ষ্ণ।

রামভুজ এবার আসল বোমাটি ছেড়ে যেন অত্যন্ত কাতরভাবে জানিয়েছে যে বাবুরা নাকি কোথায় নতুন বাসা দেখতে গেছেন। এ-বাড়ি তাঁরা ছেড়ে দেবেন।

এ-বাড়ি ছেড়ে দেবেন!—ঘনাদার গলায় মেঘের ডাকটা যেন কেমন ঝিমোনো মনে হয়েছে।

হাঁ বড়াবাবু!—রামভুজ চিড়্‌টায় চাড় লাগিয়েছে। আপনে ই মোকান ছোড়কে যাচ্ছেন, বাবুরাও তাই ইখানে আর থাকবেন না।

ব্যস, রামভুজের এর বেশী কিছু বলবার দরকার হয় নি। দুপুরে একটু দেরী করে ফেরার পর খাবার ঘরে তার কাছেই বিবরণটা শুনে ওষুধ একটু যেন ধরেছে বলে আশা হল।

আশা হবার একটা কারণ ঘনাদার হাত-ফেরতা খবরের কাগজগুলো। সেগুলো নিয়মমতই ঘনাদা ফেরৎ পাঠিয়েছেন, কিন্তু 'টু-লেট'-এর সারিতে লাল দাগ কোথায়? আমাদের সবুজ পেন্সিলের দাগরাজিই সেখানে একেশ্বর হয়ে জ্বলজ্বল করছে।

হাওয়া একটু ঘুরেছে তাহলে নিশ্চয়। চাল্ বদলে এবার কোন্ দিকে মোড় ফিরবেন ঘনাদা ?

মোড় যা ফিরলেন তা মাথা ঘোরাবার মতই।

বিকেলে আড্ডা ঘরে জমায়েৎ হয়ে ঘনাদার পরের চাল্ আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি এমন সময় সেই টেলিগ্রাম।

না, পোস্টাফিসের বিলি করা টেলিগ্রাম নয়, ঘনাদা রামভুজের হাতে টেলিগ্রাম করতে যা পাঠাচ্ছেন তারই খসড়া।

রামভুজ সে-খসড়া নিয়ে অসহায়ভাবেই আমাদের শরণ নিতে এসেছে।

বড়াবাবু ই তার আভি তুরন্ত ভেজতে বোললেন। হামি তো কেসে ভেজবে কুচ্ছু জানি না।

কি এত জরুরী টেলিগ্রাম! রামভুজের হাত থেকে নিয়ে দেখতেই হল খসড়াটা।

দেখে খানিকক্ষণ কারুর মুখে আর কোন কথা নেই। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সবাই তখন হাঁ হয়ে আছি।

টেলিগ্রাম কোথায়! এ তো কেবল গ্রাম। ভাষাটা এই—

PACIFIC COMMAND
GUAM

ACCEPTING OFFER BUT ANGRY BECAUSE PRESCRIPTION NOT FOLLOWED. HOWEVER DON'T PANIC. SHALL SAVE THE PACIFIC AGAIN. DAS.

মানে বুঝলে কিছু ?—শিবুই প্রথম সবাক হল,—ঘনাদা প্যাসিফিক কম্যাণ্ড মানে গোটা প্রশান্ত মহাসাগরের মুরুব্বী কর্তাদের প্রায় ধমকে টেলিগ্রাম করেছেন!

গায়ে পড়ে নিজে থেকে টেলিগ্রাম নয়, এটা তাদের টেলিগ্রামের জবাব—বিস্তারিত করলে গৌর,—তারা সাধাসাধি করায় অনেক কষ্টে রাজী হয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরকে আবার উদ্ধার করতে।

ওই আবার কথাটা মনে রেখো।—শিশির স্মরণ করালে,—তার

মানে এর আগেও একবার উদ্ধার করেছিলেন কিন্তু তাঁর বিধান না শোনায় নতুন করে আবার বিপদ বেধেছে। আবার উদ্ধার করবার আশ্বাস দিয়েও তাই রাগটা জানাতে ছাড়েন নি।

কিন্তু এটা লাল না সবুজ? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ঠিক! ঠিক!—সবারই এবার খেয়াল হল কথাটা। লাল তো ঠিক নয়।—দ্বিধাভরে বললে শিশির।

একটু সবজে ঝিলিক যেন মারছে!—গৌর আশায় দুলল।

আলবৎ সবুজ!—তুড়ি মেরে বললে শিবু।

হাতে পাঁজি তো মঙ্গলবার কেন? খসড়াটা নিয়ে আমি টঙের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম। অন্যেরাও আমার পেছনে। শিশির শুধু চট করে নেমে গিয়ে হেঁসেলে কি যেন বলে এল।

পা তো বাড়ালাম, কিন্তু সিঁড়ির একটা করে ধাপ উঠি আর ধুকপুকুনিও বাড়ে।

কি করবেন ঘনাদা? রঙ চিনতে ভুল যদি হয়ে থাকে তাহলে তো সর্বনাশ। শিবুকে শুধু 'আপনি'তে তুলেছিলেন আর এবার আমাদের হাতে তো সত্যিই হ্যাণ্ডনোট লিখে দেবেন।

যা হবার হয় হোক। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কপাল ঠুকে তাই ঢুকে পড়লাম টঙের ঘরে।

কই বিস্ফোরণ তো কিছু হল না! ঘনাদা এক মনে তাঁর কলকেতে টিকে সাজাতে সাজাতে একবার শুধু আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেন মাত্র। সে চোখে কি ভ্রূকুটি? না, তাও তো নয়।

আর আমাদের পায় কে?

ও কেব্‌লগ্রাম পাঠানো চলবে না ঘনাদা—গৌরই মওড়া নিলে। আমরা তখন তক্তপোশের যে যেখানে পারি বসে গেছি।

পাঠানো চলবে না বলছ?—ঘনাদাও যেন ভাবিত,—কিন্তু ওরা যে আশা করে আছে!

থাক্ আশা করে!—আমাদের মেজাজ গরম,—একবার ডাকলেই আপনি মালকোচা মেরে ছুটবেন নাকি? আপনার মান সম্মান নেই?

আর তা ছাড়া আপনি তো একবার উদ্ধার করে এসেছেন!—গৌরের জোরালো যুক্তি,—শোনে নি কেন আপনার কথা!

এখন যদি যেতে হয় তো শুধু কেব্‌লগ্রামে হবে না।—আমাদের ন্যায্য দাবী,—প্যাসিফিক কম্যাণ্ডের মাতব্বরেরা নিজেরা এসে সাধুক!

ঠিকই বলেছ।—ঘনাদা প্রশান্ত মহাসাগরের জন্যে একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানো। একেবারে যে শিরে সংক্রান্তি। এখুনি না রুখতে পারলে প্যাসিফিক যে ডেড সী হয়ে যাবে দু'দিনে। প্রশান্তর বদলে গরল সাগর!

গরল সাগর হয়ে যাবে? কিসে?

কিসে আর,—ঘনাদা তাঁর দৃষ্টিটা শিবুর ওপরই ফোকাস করে বললেন,—কাঁটায়।

কাঁটায়? কিসের কাঁটা?—শিবু তার অস্বস্তিটা সন্দেহের সুরে চাপা দিলে।

বাটা কি কই-এর কাঁটা নয়,—ঘনাদা চুটিয়ে শোধ নিলেন,—কাঁটা হল অ্যাকানথাস্টার প্লানচির, যার আরেক নাম হল কাঁটার মুকুট।

কি হয় সেই—ওই কি বলে একান যা যা···

থাক! থাক! জিভে গিঁঠ পড়ে যাবে।—ঘনাদার কাছে শিবুর আজ রেহাই নেই—ওর চেয়ে কাঁটার মুকুটই বল। কি হয় ও-কাঁটার মুকুটে জিজ্ঞাসা করছ? যা হয় তা জানাতে গিয়ে ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জের ইফালিক অ্যাটলে সমুদ্রের তলাতেই হাড় ক'খানা মাছেদের ঠোকরাবার জন্যে প্রায় রেখে আসছিলাম।

মাছেদের রুচল না বুঝি!—প্রায় সর্বনাশই করে বসল শিবু তার গায়ের জ্বালাটা চাপতে না পেরে।

আমরা তো তখন দম বন্ধ করে আছি।

রুচল নাই বলতে পারো।—ঘনাদা কিন্তু একটু হেসে বললেন,—তবে তা রুচলে সিগুয়াটেরা আর শিঙে-শাঁখ ট্রাইটন, স্কুবা গিয়ার আর দশানন রাবণেরও দর্পহারী যোল থেকে একুশ বাহুবলে বলী সমুদ্রত্রাস অ্যাকানথাস্টার প্লানচির কথা অজানাই থাকত, আর প্যাসিফিক

কম্যাণ্ডের টনক নড়বার আগে অর্ধেক প্যাসিফিকই যেত সত্যি যাকে বলে রসাতলে। যাক্ সে কথা।

মাথাগুলো তখন ঘুরছে কিন্তু ঘনাদাকে যে আবার না চাগালে নয়।

আমাদের কথা যেন ভুলে গিয়ে নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাবে তিনি যে তাঁর গড়গড়ায় টান শুরু করেছেন।

চোখের দৃষ্টিতে শিবুকে প্রায় ভস্ম করে ঘাটের কাছে এ ভরাডুবি বাঁচাবার উপায় খুঁজছি এমন সময় টঙের ঘরের দরজায় স্বয়ং সঙ্কট-মোচনের আবির্ভাব।

বেশটা অবশ্য তাঁর বনোয়ারীর আর হাতে সদ্যভাজা দিগ্বিদিকে সুবাস ছড়ানো মশলা পাঁপরের একটি চ্যাঙাড়ি।

বুঝলাম তাড়াতাড়িতে এর চেয়ে জবর কিছু ব্যবস্থা করে আসতে পারে নি শিশির।

কিন্তু দিনটা আমাদের পয়া। ওই মুশলা পাঁপরেই ডবল প্লেট প্রন্ কাটলেটের কাজ হয়ে গেল। তার আগে ছোট একটু ফাঁড়া অবশ্য কাটাতে হয়েছে।

ঘনাদা গন্ধের টানেই মুখ ঘুরিয়েছিলেন। বনোয়ারী চ্যাঙাড়িটা তাঁর সামনেই সসম্মানে রাখবার পর গড়গড়ার নলটা সরিয়ে যেন অন্যমনস্কভাবে একটা তুলে নিয়ে কামড় দিয়েই হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছেন, – নিচে রামভুজের ভাজা নাকি ?

বনোয়ারী কি যেন বলতে যাচ্ছিল। আমরা সবাই এক সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠেছি।

রামভুজের ভাজা মানে! রামভুজের হাতের পাঁপর এমন, দাঁতে দিলে কথা বলবে। দস্তুরমত মোড়ের রাজস্থানী পাঁপর।

সেই সঙ্গে পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে বলে বনোয়ারীকেও তাড়া দিতে হয়েছে। যা যা দেরী করিস নি। চা নিয়ে আয় শিগগীর।

আমাদের আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে চা আনতে আনতেই অর্ধেক

চ্যাঙাড়ি অবশ্য একাই ফাঁক করে ফেলছেন ঘনাদা। তারপর মৌজ করে তাঁকে চায়ে চুমুক দিতে দেখে সুতোটা আবার ধরলাম।

ইচ্ছে করে একটু ন্যাকাও সাজতে হল,—প্যাসিফিকে কোথায় কোন টোলের কথা যেন বলছিলেন আপনি।

টোল নয় অ্যাটল! – ঘনাদা খুশি হলেন শুধরে,—অ্যাটল কাকে বলে জানো নিশ্চয়। অকূল সমুদ্রের মাঝখানে প্রবালে গড়া এক একটা গোলাকার স্থলের বালা আর সেই বালার মাঝখানে স্বপ্নের মত এক সায়র। মাঝখানের এই সায়রটুকুর জন্যে অ্যাটল সাধারণ প্রবালদ্বীপ থেকে আলাদা। আকারেও তা ছোট। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে অসংখ্য এই সব প্রবাল-দ্বীপ আর অ্যাটলের ফুটকি ছড়ানো।

অ্যাটল তো নয় সে যেন পৃথিবীতে নন্দনকাননের নমুনা।

গিলবার্ট মার্শাল মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে তখন ক্যারোলাইনে গিয়েছি সেখানকার ম্যালাও-পলিনেশিয়ান ভাষার আদি রূপ খুঁজে বার করতে।

সেটা রথ দেখা মাত্র। আসল কলা বেচার কাজ হল প্যাসিফিকে গোপনে শিঙে-শাঁখের শুমারি নেওয়া আর তার চোরা শিকারীদের শায়েস্তা করা। আই. এম. সি. ও. মানে ইণ্টার গভর্ণমেণ্টাল ম্যারিটাইম কনসলটেটিভ অর্গানিজেশনই অবশ্য পাঠিয়েছিল।

না, কাশি-টাশি নয়। শিবুকে শুধু একটু চোরা রামচিমটি কাটতে হল তার জিভের রাশ টানবার জন্যে।

ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জের ইফালিক বলে এক অ্যাটলে তখন গিয়ে উঠেছি।—ঘনাদা তখন বলে চলেছেন,—নামে অ্যাটল কিন্তু সত্যিই যেন পরীস্থান। যেমন তার মাঝখানের কাকচক্ষুজলের সায়র, তেমনি পরীদের যেন পাউডার বিছানো তার তীর আর তেমনি তার সারা দিনরাত হাওয়ায় দোলা নারকেলের বন।

ইফালিক অ্যাটলেই পামারের সঙ্গে দেখা। পামার আর তার

তিন সঙ্গী মিলে সেই অ্যাটলে বাসা বেঁধেছে।

পামারকে দেখলে যেন সমুদ্রের তরুণ দেবতা বলেই মনে হয়। যেমন শক্ত সবল তেমনি সুঠাম শরীর। পামারের সঙ্গী তিনজনও সবাই লম্বা চওড়া জোয়ান, যেন অলিম্পিকস্ থেকেই সব ফিরেছে। শুধু তাদের মুখগুলো যেন শরীরের সঙ্গে খাপ খায় না। দেহগুলো তাদের গ্রীক দেবতার আর মুখগুলো যেন দানবের।

ইকালিকের দুধে ধোয়া বালির তীরে তারা সারাদিন শুধু একটু কোপ্‌নি মাত্র পরে জল-খেলা করে। জলে সাঁতার, ঢেউয়ের ওপর তক্তা ভাসিয়ে ঘোড়ার মত সওয়ার হয়ে দূর সমুদ্র থেকে তীরে ছুটে আসা, যাকে বলে সারফিং, কখনও বা হাতে পায়ে মাছের ডানার মত ফ্লিপার আর মুখে অক্সিজেনের মুখোস নিয়ে সমুদ্রের তলায় ডুব সাঁতার, এই নিয়ে তাদের দিন কাটে।

ইকালিক অ্যাটলে পামার আর তার সঙ্গীদের দেখে আমি প্রথমে বেশ একটু অবাকই হয়েছিলাম। মাইক্রোনেশিয়ার এক অত্যন্ত আদিম গোষ্ঠীর কিছু কিছু লোক ইকালিক ও তার কাছাকাছি প্রবাল-দ্বীপে ও অ্যাটলে থাকে বলে জানতাম। ম্যালাও-পলিনেশিয়ান ভাষার মূল কিছু ধারা তাদের কাছে সংগ্রহ করবার আশায় এ দ্বীপে আসা। কিন্তু ইকালিক-এ তাদের তো কোনো চিহ্নই দেখতে পেলাম না।

পামারকে সেই কথাই গোড়ায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। পামার তাচ্ছিল্যভরে কথাটা উড়িয়েই দিয়েছিল। বলেছিল, কে জানে কোথায় গেছে। এখানে থাকলে তো আমরাই এসে তাড়াতাম।

কথাটা ঠাট্টা হিসেবেই নিয়েছিলাম। পামার আর তার সঙ্গীদের কতকগুলো রসিকতা কিন্তু একটু বেয়াড়া ধরনের। যেমন, আমাকে নিয়ে তাদের ঠাট্টা গোড়া থেকেই যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেত।

আমি আমার ছোট ইয়ল-এ সেখানে গিয়ে নামবার পরই অভ্যর্থনাটা একটু জোরালো রকম পেয়েছিলাম। নোঙর ফেলে ইয়ল থেকে নামতে-না-নামতেই তো পামারের কোলাকুলিতে ওষ্ঠাগত

প্রাণ। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা জোয়ান পামার করমর্দন করার ছলে হাতের হেঁচকা টানেই তো প্রথম বালির ওপর আমায় আছড়ে ফেলল। সেখান থেকে ওঠার পরও রেহাই নেই। এক এক করে পামারের তিন সঙ্গীর হাত ঝাঁকানির উৎসাহে আরও তিনবার বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়তে হল। শেষবার ওঠবার পর পামার কাছে এসে জড়িয়ে বুকের মধ্যে চিঁড়েচেপটা করে মার্কিন স্ল্যাং-এ যা বললে বাংলায় তা বোঝাতে গেলে বলতে হয়,—কোথা থেকে এলে বল তো চাঁদ ?

অতি কষ্টে ককিয়ে বললাম, দম না পেলে বলি কি করে ?

পামার সজোরে বালির ওপর আমায় ছুঁড়ে দিয়ে আমার অনুরোধ রাখলে। আমি অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে ওঠার পর দেখি চারজনই আমায় ঘিরে আছে। পামারের একজন সঙ্গী আবার প্রশ্ন করলে, সত্যি করে বল্ তো কি মতলবে এখানে এসেছিস ?

যা সত্য তা বলে কোনো লাভ নেই জেনে মিথ্যে একটা অজুহাত তখনই বানালাম। বললাম, স্কুবা-ডাইভিং-এর সখ। তাই নির্জন একটা দ্বীপের খোঁজ করতে করতে এখানে এসে পড়েছি। কোনো মতলব নিয়ে আসি নি।

বেশ বেশ—পামার পিঠে বিরাশী সিক্কার একটি থাপ্পড় মেরে উৎসাহ দিলে,—স্কুবা-ডাইভিং-এর সখ তোমার মিটিয়ে দেব।

তা সত্যিই তারা মিটিয়ে দিলে। রোজ দুবেলা হাতে পায়ে মেছো ফ্লিপার আর পিঠে সিলিণ্ডার বেঁধে, মুখে অক্সিজেনের মুখোশ নিয়ে সমুদ্রের তলায় ডুব-সাঁতারে যেতে হয়। জলের তলায় যা নাকানিচোবানি তারা খাওয়ায় তাতে শেষ পর্যন্ত শুধু প্রাণটা নিয়ে কোনো মতে ফিরতে পারি।

একদিন সে আশাটুকুও আর রইলো না।

পামার আর তার সঙ্গীদের অমানুষিক অত্যাচার তখন কিন্তু একদিক দিয়ে আমার কাছে শাপে বর হয়েছে। জুলুম জবরদস্তির ওই ডুব-সাঁতারেই প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বনাশ কেমন করে ঘনাচ্ছে

আর তার আসানের উপায় কি, সে হদিস আমি আরো ভালো করে পেয়ে গেছি।

কিন্তু সমুদ্রের তলাতেই আমার কবর হলে সেখানকার যে ভয়ঙ্কর রহস্য আমি জেনেছি তা তো আমার সঙ্গেই লোপ পাবে।

পামার আর তার সঙ্গীরা সেদিন সেই ব্যবস্থাই করেছে।

চারজনেই একসঙ্গে সেদিন স্কুবা-গিয়ার নিয়ে সমুদ্রের তলায় টহলে নেমেছিলাম। প্রবাল-দ্বীপের সমুদ্র সত্যিই যেন এক স্বপ্নের রাজ্য। গভীর জলের তলায় নানা আকার ও রঙের প্রবাল যেন এক আশ্চর্য স্বপ্নের ফুল বাগান সাজিয়ে রাখে। সেখানে যেসব মাছেরা ঘুরে বেড়ায় তারাও যেন কোন্ খেয়ালী শিল্পীর হাতে তৈরী ও আঁকা সব রঙ-বেরঙের অবাক মাছের কল্পনা।

ইকালিক অ্যাটল-এর সমুদ্রের তলায় একটা ব্যাপার গোড়া থেকেই তাই বিস্মিত করেছে।

প্রবাল-দ্বীপের সমুদ্র, কিন্তু তার তলায় কোথায় সে রঙ-বেরঙের জলের প্রজাপতির মত মাছ আর প্রবালের সেই পুষ্পিত শোভা?

এখানে প্রথম থেকেই প্রবালের ওপর কি যেন এক অভিশাপ লেগেছে বলে মনে হয়েছে। রঙ-বেরঙের প্রবালের বদলে শুধু খড়িমাটির মতো ফ্যাসফেসে যেন প্রবালের কঙ্কাল। রঙিন মাছের বদলে সেই সাদা প্রবাল-কঙ্কালের ওপর যেন বিদ্‌ঘুটে সব কাঁটা গাছের ঝোপ।

সমুদ্রের তলার এই কুৎসিত রূপ দেখাতে সেদিন অবশ্য আমিই পামারদের এনেছিলাম। এনেছিলাম এই বিশ্বাসে যে আমায় নিয়ে তাদের ফুর্তি করার ধরনটা বেশ একটু আসুরিক হলেও, পামার আর তার সঙ্গীরা একেবারে অমানুষ হয়ত নয়।

আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

আগের দিন পামারের এক সঙ্গী একা একাই সমুদ্রে সাঁতার দিতে গিয়েছিল। ফিরল যখন তখন প্রায় আধমরা। একটা পা

যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে আর সেই সঙ্গে অনবরত বমি করছে।

ব্যাপারটা কি হয়েছে তা বুঝে তখনই আমি ওষুধ দিয়ে তাকে সারাবার ব্যবস্থা করি আর সেই সঙ্গেই পামারকে কয়েকটা স্পষ্ট কথাও শোনাতে বাধ্য হই।

অন্য সময় হলে কি করত তা জানি না, তবে চোখের ওপর তার মরণাপন্ন সঙ্গীকে বাঁচাতে দেখার পর পামার তখন আমার কথায় একটু কান না দিয়ে পারে নি।

কি বলতে চাও তুমি?—পামার ঝাঁঝের সঙ্গেই অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিল,—সমুদ্রের অভিশাপে লিওর এই দশা হয়েছে?

হ্যাঁ,—জোর দিয়েই বলেছি,—আর সে অভিশাপ তোমাদের মত অবুঝ, লোভী মানুষই প্রশান্ত মহাসাগরে ডেকে আনছে।

পামারের বাকী দুই সঙ্গী জো আর মার্ফি তখন ঘুষি বাগিয়ে প্রায় মারমুখো।

পামার চোখের ইশারায় তাদের ঠেকিয়ে কড়া গলায় জানতে চেয়েছে, লোভটা আমাদের কোথায় দেখলে?

দেখেছি কাল তোমাদের স্কুনার-এরই গুদাম ঘরে।—শান্তস্বরেই বলেছি।

এবার মার্ফি আর জো দুদিক থেকে বুনো মোষের মত প্রায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! কিন্তু পামারের ধৈর্য অনেক বেশী. দু-হাতে দু-জনকে রুখে সে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেছে,—আমাদের স্কুনারে কার হুকুমে তুমি উঠেছিলে?

একটু হেসে বলেছি,—হুকুম দরকার বলে তো মনে হয় নি। আপনাদের স্কুবা-ডাইভিং-এর উৎসাহ যে একটা ছল মাত্র তা তো জানতাম না।

পামার অনেক কষ্টে এবারও সঙ্গীদের সামলে জিজ্ঞাসা করেছে, —আমাদের লোভে যা ডেকে আনছি সমুদ্রের সে অভিশাপটা কি তা জানতে পারি?

কাল আমার সঙ্গে অনুগ্রহ করে একবার স্কুবা-ডাইভিং-এ গেলেই

তা দেখাতে পারবো।

পামার আমার অনুরোধ রাখতে রাজী হয়েছে। তার ধৈর্য দেখেই একটু অবাক হয়েছিলাম। আসল মতলবটা তখনও বুঝতে পারি নি।

অসুস্থ লিওকে অ্যাটলের তাঁবুতেই রেখে এসে আমরা চারজন তখন স্কুবা-গিয়ার-এর দৌলতে ইফালিক-এর বাইরের সমুদ্রে ডুব-সাঁতার দিয়ে চলেছি। প্রবাল-সমুদ্রের অপরূপ রঙিন শোভার বদলে নীচে সেই ফ্যাকাসে সাদা পাথুরে মাটি আর কুৎসিত কাঁটার ঝোপ।

নীচের দিকে নেমে যা দেখাবার ভাল করে দেখাতে যাচ্ছি এমন সময় পিঠে একটা হ্যাঁচকা টান টের পেলাম। পরমুহূর্তে বুঝলাম আমার পিঠের অক্সিজেন সিলিণ্ডার ওপর থেকে পামারের দলের কেউ ছুরি দিয়ে কেটে টেনে নিয়েছে। যেন বিদ্যুতের চাবুক খেয়ে ওপর দিকে ঘুরলাম। কিন্তু তখন আর সময় নেই, আমার অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা নিয়ে পামার আর তার দুই সঙ্গী তীরের বেগে দূরে চলে যাচ্ছে। বিনা অক্সিজেনে তাদের সঙ্গে সাঁতারের পাল্লা দেবার কোনো আশাই নেই আর সাঁতরে তাদের ধরতে পারলেও লাভ কি হবে। তাদের তিনজনের কাছে আমি একলা। পামার যে মনে মনে এত বড় শয়তানী ফন্দি এঁটেছে সেটুকু বুঝতে না পেরেই আমি নিজের শমন নিজেই ডেকে এনেছি।

পামার আর তার সঙ্গীরা কি আনন্দে তারপর ইফালিক অ্যাটল থেকে তাদের স্কুনার-এ রওনা হয়েছে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

কিন্তু সত্যিই যেন সমুদ্রের অভিশাপ তাদের তখন তাড়া করে ফিরছে। সমুদ্রে প্রথম রাতটা কাটবার পরই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তাদের তিনজন যেমন অবাক একজন তেমনি ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত সেই লিও। ঘুমন্ত অবস্থায় তার মুখে কে একদিকে আলকাতরা আর একদিকে চুন মাখিয়ে দিয়েছে।

সেদিন খুনোখুনি একটা ব্যাপার প্রায় হয়ে যাচ্ছিল। জো আর মার্কি ছাড়া একাজ আর কেউ করতে পারে না ধরে নিয়ে লিও

প্রথমেই তাদের ওপর চড়াও হয়েছে। নেহাৎ পামার এসে বাধা না দিলে ব্যাপারটা রক্তারক্তি পর্যন্তই গড়াত।

পরের দিন কিন্তু পামারের মাতব্বরিতেও ঝগড়াটা মিটতে চায় নি। সেদিন ভোরে দেখা গিয়েছে জো আর মার্কির মাথার চুল খাবলা খাবলা করে কে যেন তাদের ঘুমের মধ্যে রাত্রে কেটে দিয়েছে।

পামারকে এদিন গায়ের জোর খাটিয়েই দাঙ্গা সামলাতে হয়েছে। কিন্তু তার পরদিন সকালে তার নিজের মুখেই চুনে আর আলকাতরায় মাখামাখি দেখবার পর রাগের চেয়ে আতঙ্কটাই বেশী হয়েছে সকলের।

এসব কি ভুতুড়ে ব্যাপার?

সব চেয়ে ভুতুড়ে ব্যাপার তারা সেইদিনই আবিষ্কার করেছে। জাহাজে তাদের লুকোনো গুদামঘর খুলতে গিয়ে পামার একেবারে হতভম্ব। সে ঘর একদম খালি।

পামার তার স্কুনারের ডেক-এ সঙ্গী তিনজনকে ডেকে রেগে আগুন হয়ে এসব কিছুর মানে জানতে চেয়েছে। জ্বলন্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে,—ঠিক করে বল এ শয়তানী তোমাদের কার?

সঙ্গীদের কারুর মুখে কোন কথা নেই।

পামার তার হাতের শঙ্কর মাছের হাণ্টারটা দুবার শূন্যে আস্ফালন করে হিংস্র বাঘের মতো গর্জন করে জানতে চেয়েছে,—জবাব না পেলে তিনজনের পিঠের ছাল চামড়া এই চাবুকের ঘায়েই আমি ছাড়িয়ে নেব। এখনও বল, কে এ কাজ করেছে?

আজ্ঞে আমি।

পামার আর তার তিন সঙ্গী চমকে দিশাহারা হয়ে চারিদিকে চেয়েছে। কে দিলে এ জবাব? আশেপাশে কোথাও কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

কড়া রাখবার চেষ্টাতেও একটু কেঁপে-ওঠা গলায় পামার জিজ্ঞাসা করেছে,—কে? কে কথা বলছে?

আজ্ঞে আমি, ইকালিকের সমুদ্রে যাকে চুবিয়ে মেরেছিলেন সেই দাসের ভূত।

দাসের ভূত!—পামার আর তার তিন সঙ্গী দিশাহারা হয়ে এবার চারিদিক খুঁজে দেখেছে। কই কোথাও কারুর কোনো চিহ্নই তো নেই।

আকাশবাণীর মতো সেই ভুতুড়ে স্বর আবার শোনা গেছে,—অত খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। চাক্ষুষই এবার আমি দেখা দিচ্ছি।

দেখা দেবার আগে পামারের দল তখন ভুতুড়ে আওয়াজের হদিস পেয়ে গেছে। একটা মাস্তুলের তলায় বাঁধা একটা রবারের নলের মুখে লাগানো ছোট একটা স্পীকার।

তারা সেটা নিয়ে যখন টানাটানি করছে তখনই পাশের মাস্তুল থেকে ডেক-এর ওপর নেমে এসে দাঁড়িয়েছি।

ওসব নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? অধীন আপনাদের সামনেই হাজির।

স্কুনারে যেন বাজ পড়েছে এমনই চমকে চারজন আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে এবার।

তুই!......

পামার রাগে তোতলা হয়ে গেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ আমি।—মোলায়েম গলায় বলেছি,—ভূত হয়েও আপনাদের মায়া ছাড়তে পারি নি।

এসব শয়তানী তাহলে তোর?

তুই-ই আমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়েছিস?

আমাদের লুকোনো মাল তুই-ই সরিয়েছিস?

চারজনেই একসঙ্গে গর্জে উঠেছে তখন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। সবিনয়ে স্বীকার করে বলেছি,—আপনারা অক্সিজেন সিলিণ্ডার কেড়ে নিয়ে সমুদ্রের তলায় ছেড়ে দিয়ে আসবার পর দেহটি সেইখানে ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে ওপরে ভেসে উঠি। আপনারা তখন ইকালিক অ্যাটল থেকে ডেরা তুলে এই স্কুনারে সবে পড়বার যোগাড় করছেন। সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে এই জাহাজেরই ইঞ্জিন-

ঘরে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। তারপর মনে হল আমায় নিয়ে যা রসিকতা এর আগে করেছেন তার একটু ঋণ শোধ না করলে ভালো দেখায় না। তাই আপনাদের মুখগুলোর ওপর একটু হাতের কাজ দেখিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আপনাদের বড় সাধের লুকোনো দৌলতও একটু হাতসাফাই করেছি।

আমার কথা শেষ হবার আগেই চারদিক থেকে আফ্রিকার সবচেয়ে ক্ষ্যাপা চারটে জানোয়ার যেন আমায় তাড়া করে এল। তাদের একটা গণ্ডার, একটা বুনো মোষ, একটা হাতি আর একটা সিংহ।

ঠকাস্ করে প্রচণ্ড একটা শব্দ হল তারপর। আমি তখন জাহাজের রেলিঙের ধারে। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—আহা লাগল নাকি?

চার যণ্ডা যেন তুফানের ঢেউ হয়েই এবার ঝাঁপিয়ে এল আমার দিকে।

রেলিঙে লেগে দুজনের মাথা ফাটল, আর দুজন রেলিং টপকে পড়তে পড়তে কোনরকমে রেলিঙের বার ধরে ফেলে নিজেদের সামলাল।

আমি তখন বাণ মাছের মতো পিছলে গাবার মাস্তুলের দিকে চলে গেছি। সেখান থেকে যেন মিনতি করে বললাম,—মিছিমিছি হয়রান হয়ে মরছেন কেন? বললাম তো এখন আমি সূক্ষ্ম শরীরে আছি। ভূত প্রেত কি গায়ের জোরে ধরা যায়?

আমার উপদেশটা মাঠেই মারা গেল। চারমূর্তি আবার এল পাঁয়তাড়া কষে। বাধ্য হয়ে আরও কিছুক্ষণ তাই খেলতে হল তাদের নিয়ে। সে খেলা শেষ হবার পর ডেকের ওপর চার যণ্ডাই লম্বা। হাপরের মত তাদের শুধু হাঁপানিই শোনা যাচ্ছে।

চারজনকেই এবার একটু কষ্ট করে বাঁধতে হল। সবশেষে পামারকে বাঁধতে বাঁধতে বললাম,—মাপ করবেন, বেশীক্ষণ বাঁধা থাকতে আপনাদের হবে না। গুয়াম-এর কাছেই প্রায় এসে

পড়েছি। সেখানে পৌঁছেই আপনাদের ছেড়ে দেব।

গুয়াম!—ঐ অবস্থাতেই পামার হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে উঠল,—গুয়াম এখানে কোথায়?

বেশী দূরে নয়।—আশ্বাস দিয়ে বললাম,—আমরা আপ্রা বন্দরের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছি। বেতারে প্যাসিফিক কমাণ্ডের অনুমতি পেলেই পিটি জেটিতে গিয়ে স্কুনার ভেড়াব।

গুয়াম, আপ্রা, পিটি শুনে চারজনেরই চক্ষু তখন চড়কগাছ। তারই মধ্যে কি যেন বলতে গিয়ে পামারের গলায় অস্পষ্ট একটা গোঙানি শুধু শোনা গেল।

ব্যাখ্যাটা নিজেই এবার করে দিলাম,—যতটা ভাবছেন ব্যাপারটা তত আজগুবি নয়। আপনারা ওপরের কনট্রোল রুমে হালের চাকা ঘুরিয়েছেন আর আমি এ ক'দিন ইঞ্জিনঘরে লুকিয়ে কল বিগড়ে দিয়ে জাহাজের গতি পালটে দিয়েছি।

উত্তরে চারজনে প্রাণপণে বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করলে খানিক। চোখের দৃষ্টিতে আগুন থাকলে তখন ঐখানেই ভস্ম হয়ে যেতাম।

তাদের ঐ অবস্থায় রেখে কনট্রোল রুমে গিয়ে রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে বসলাম।

প্রথমেই তাতে ডাক পাঠালাম,—প্যান···প্যান···প্যান।

প্যান প্যান করলেন তাহলে?—জিভের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিল। কোনো রকমে নিজেকে সামলালাম। আমাদের মনের সন্দেহটা চোখে সম্পূর্ণ কিন্তু লুকোনো বোধ হয় যায় নি।

ঘনাদা তাই আমাদের ওপর একটু করুণা কটাক্ষ করে বললেন,—প্যানপ্যানটা বুঝলে না বুঝি? ওটা হল আন্তর্জাতিক রেডিও সঙ্কেত। প্যান প্যান শুনলেই যেখানে যত রেডিও চালু আছে সব কান খাড়া করে থাকবে। এর পরেই খুব জরুরী কিছু খবর দেওয়া হবে প্যানপ্যান তারই সংকেত।

প্যানপ্যানের রহস্য বুঝিয়ে দিয়ে ঘনাদা আবার বলতে শুরু করলেন,—প্যানপ্যান সংকেতের পর যে খবরটা ছাড়লাম সেটি শুনতে দু কথার

হলেও একেবারে একটি মেগাটন বোমা। রেডিওতে জানালাম,— প্যাসিফিক বাঁচাবার দাওয়াই নিয়ে এসেছি। বন্দরে ঢুকতে দাও।

খানিকক্ষণ রেডিওতে কোনোদিক থেকে কোনো সাড়াই নেই। রেডিও-সঙ্কেত আর সংবাদ যারা পেয়েছে তারা সবাই বোধহয় হতভম্ব। আমার সংবাদটা আরও দুবার পাঠাবার বেশ কয়েক মিনিট বাদে একটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ প্রশ্নই শোনা গেল। নেহাৎ যান্ত্রিক রেডিও না হলে সেটা মেঘ-গর্জনের মতই শোনাতো।

প্রশ্নটা হল,—কে তুমি? প্যাসিফিক বাঁচাবার কথা নিয়ে কি প্রলাপ বকছ?

জবাবে জানালাম,—আমার পরিচয় পরে পাবেন। আমার প্রলাপ আগে আর একটু শুনুন। গুয়াম-এর বাইশ মাইল প্রবাল প্রাচীর কিসে ধ্বংস হয়েছে জানেন নিশ্চয়। অস্ট্রেলিয়ার একশ বর্গমাইল ব্যারিয়ার রীফ্-ই বা ধ্বসে গলে গিয়েছে কিসে? সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়ানো সব প্রবাল-দ্বীপ আজ দিন গুনছে কোন্ অমোঘ সর্বনাশের? প্রশান্ত মহাসাগরের এই ভয়ঙ্কর অভিশাপের নাম কি অ্যাকান্থ্যাস্টর প্লাঙ্কি?

আর কিছু বলতে হল না। গুয়ামের প্যাসিফিক কমাণ্ডের ঘাঁটি থেকেই ব্যস্ত ব্যাকুল প্রশ্ন এল রেডিওতে,—এ অভিশাপ কাটাবার উপায় সত্যিই আছে?

জানালাম, আছে কিনা পরখ করেই যান না। আমি বন্দরের বাইরেই স্কুনার নিয়ে অপেক্ষা করছি।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই দুটি গান-বোটে প্যাসিফিক হাই কম্যাণ্ডের তিন তিন জন মাথা এসে হাজির।

প্রথমটায় তিনজনেই বেশ একটু সন্দিগ্ধ। একজন তো গরম হয়ে আমার ওপর তম্বিই করলেন,—কই কোথায় তোমার প্যাসিফিক বাঁচাবার দাওয়াই?

একটু হেসে তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে স্কুনারের একটা গুপ্তঘর খুলে দিলাম।

তিনজনই তখন আমার ওপর খাপ্পা,—রসিকতা হচ্ছে আমাদের

সঙ্গে ? এই তোমার দাওয়াই ? এ তো এক জাতের শিঙে-শাঁখ, ট্রাইটন, ঘর সাজাবার জন্যে সৌখীন লোকেরা চড়া দামে কেনে।

হ্যাঁ, তা কেনে, আর তাই থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরের চরম সর্বনাশের সূচনা। গত ক'বছর ধরে হঠাৎ রক্তবীজের মত লাখে লাখে বেড়ে উঠে যে অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লাঙ্কি প্রবাল আবরণ খেয়ে খেয়ে ফেলে প্রশান্ত মাহাসাগরের সমস্ত ছোট বড় দ্বীপ ধ্বংস করে দিচ্ছে এই শিঙে-শাঁখ ট্রাইটন তারই যম। বাচ্চা অবস্থাতেই অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লাঙ্কি খেয়ে ফেলে এই ট্রাইটন তাদের অভিশাপ হয়ে ওঠার মত বংশবৃদ্ধি করতে দেয় না। কিন্তু নিজেদের লোভে আর আহাম্মুকিতে এই ট্রাইটন শিকার করে মানুষ তার নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। মানুষের সেই রকম শত্রু চারজনকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি আর সেই সঙ্গে দিচ্ছি প্রশান্ত মহাসাগরকে আবার সুস্থ করে তোলার দাওয়াই এই ট্রাইটন।

ঘনাদা চুপ করলেন। আমাদের সকলের মুখেই তখন এক জিজ্ঞাসা,—অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লাঙ্কিটা কি জিনিস ?

জিনিস নয় প্রাণী, ওর আর একটা ডাক নাম হল কাঁটার মুকুট।

কাঁটার মুকুট ?—আমরা তাজ্জব,—ঐ কাঁটার মুকুটেই অস্ট্রেলিয়ার একশ বর্গমাইল ব্যারিয়ার রীফ লোপাট হয়ে গেল ? গুয়ামের বাইশ মাইল প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হয়ে গেল ওতেই ?

হ্যাঁ।—ঘনাদা অর্ধনিমীলিত চোখে গড়গড়ায় একটা সুখটান দিয়ে বললেন,—ঐ কাঁটার মুকুট অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লাঙ্কি বিকট এক জাতের তারা মাছ। রাবণের কুড়িটি হাত ছিল বলে শুনি আর হাত দেড়েক চওড়া এ তারা মাছের খোল থেকে একুশটা পর্যন্ত বাহু হয় সমস্তটাই সাংঘাতিক কাঁটায় ভর্তি। সে কাঁটায় সিগুয়াটেরা নামে এমন এক দারুণ বিষ থাকে যে গায়ে ফুটলে শরীর অসাড় হয়ে যায় আর বমির ধমক থামতে চায় না। ইফালিক অ্যাটলে এই কাঁটা লেগেই লিওর ঐ দুর্দশা হয়েছিল। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত এই সর্বনাশা তারামাছ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হবার কোনো কারণই ঘটেনি।

তারপর জানা অজানা নানা কারণে সত্যিই রক্তবীজের মত এ অভি-শাপের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সমস্ত প্রবাল-দ্বীপের তলায় গিজগিজ করছে এখন এই 'কাঁটার মুকুট'। এদের আহার হল প্রবাল। প্রবালের ওপরের খোলস খেয়ে ফেলার পর যে-প্রবাল প্রাচীর প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপের রক্ষাকবচ হিসেবে ঘিরে থাকে তা দুর্বল হয়ে সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাত আর ঠেকাতে পারে না। দ্বীপগুলির চারিধারে সেখানকার সাধারণ মাছ প্রবাল প্রাচীরের আড়ালে আর আশ্রয় পায় না। দ্বীপগুলিও ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে। এ 'কাঁটার মুকুট'-এর ক্ষিদে এমন রাক্ষুসে যে এদের একটি ঝাঁক এক মাসে আধ মাইল প্রবাল প্রাচীর খেয়ে ফেলতে পারে আর ফেলছেও তাই। এ রাক্ষুসে তারামাছের একমাত্র যম হল শিঙে-শাঁখ ঐ ট্রাইটন। ট্রাইটন শিকার বন্ধ করে আবার 'কাঁটার মুকুট'-এর ঐ স্বভাবশত্রুকে বাড়তে দিলে প্রশান্ত মহাসাগরকে বাঁচানো এখনও সম্ভব। প্যাসিফিক কম্যাণ্ডকে এই দাওয়াই-ই বাতলে এসেছিলাম।

খানিকক্ষণ আমাদের জিভ টিভ সব অসাড়।

কাঁটার খোঁচাটার আসল যে লক্ষ্য সেই শিবু তো লজ্জায় অধোবদন।

ঘনাদাকে প্যাসিফিক কম্যাণ্ডের ডাকে যেতে আমরা দিই নি। অত যদি তাদের গরজ তাহলে শুধু টেলিগ্রাম কেন নিজেরা এসে ঘনাদাকে তারা নিয়ে যাক।

কিন্তু এলে ঠিকানাটা তো তাদের খুঁজে পাওয়া চাই। খবরের কাগজের টু-লেট দাগান ছেড়ে ঘনাদাকে বাহাত্তর নম্বরেই তাই বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করে থাকতে হচ্ছে।

আমাদেরও এ অবস্থায় ঘনাদাকে একলা এখানে ছেড়ে যাওয়া কি ভালো দেখায়?

বাহাত্তর নম্বরই তাই এখনও গুলজার।

সাংঘাতিক অবস্থা বাহাত্তর নম্বরের।

কেন কি হল ?

কি আবার হবে! খেয়ে বসে সুখ নেই। রাত্রে ঘুম নেই।

কি হয়েছে কি আসলে ?

যা হয়েছে তাই জানাতেই ত টঙের ঘরে সাত সকালে গিয়ে হাজির হয়েছি।

আমাদের চেহারাগুলোই আমাদের বক্তব্যের বিজ্ঞাপন।

শিশিরের চুলে অন্ততঃ হপ্তাখানেক তেল পড়েনি। মাথাটা যেন কাকের বাসা!

গৌর দাড়ি কামায়নি ক'দিন তা কে জানে! জামাটা যে ময়লা আর বোতামগুলো যে ছেঁড়া তাও তার খেয়াল নেই।

শিবু গালে ক্ষুর লাগায়নি মাথায়ও তেল ছোঁয়ায়নি ত বটেই, তার ওপর ক'দিন ক'রাত্রি ঘুম না হওয়ায় প্রমাণ স্বরূপ দু'চোখের কোণে এমন কালি লাগিয়েছে।

আর আমি? ভয়ে ভাবনায় দিশেহারা হয়ে দু পাটির দুটো আলাদা জুতো দুপায়ে গলিয়ে ভুল করে শিবুর ঢাউস সার্টটাই গায়ে চড়িয়ে এসেছি।

টঙের ঘরে প্রায় ফাঁসির আসামীর মতো কালিমাড়া মুখে ঢুকে তক্তপোষের ধারে কোন রকমে বসেও আমরা প্রথমটা যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছি।

যা বলতে এসেছি আমাদের ভয়ে-শুকনো গলা ঠেলে তা যেন বেরুতেই চায়নি।

কি করেছেন তখন ঘনাদা?

না, একেবারে নির্বিকারভাবে তাঁর তক্তপোষটির ওপর বসে গড়গড়ায় টান দেননি। এমন কি তাঁর কেরাসিন কাঠের শেল্‌ফ হাতড়ে আশ্চর্য কিছু খুঁজে বার করবার চেষ্টাও তাঁর দেখা যায়নি।

একটু ভালো করে শার্লকী দৃষ্টিতে মেঝেটা লক্ষ্য করলে একটু যেন সন্দেহজনক ব্যাপারেরই আভাস পাওয়া যায়।

মেঝের ওপর গড়গড়ার কলকেটা টিকে ছাই ইত্যাদি ছড়িয়ে যেভাবে পড়ে আছে তাতে মনে হয় কেউ যেন অসাবধানে তাড়াতাড়ি সেটা পা দিয়ে লাথিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু তাঁর অত আদরের গড়গড়া আর সাজা কলকেতে তাড়াতাড়ি অসাবধানে পা লাগানো কি ঘনাদার পক্ষে সম্ভব?

অমন অসাবধান তিনি হবেনই বা কেন হঠাৎ বিচলিত না হলে?

ছাদের ওপরে দেখার আগেই সিঁড়িতে আমাদের পদশব্দ আর

হাহাকার শুনেই ঘনাদা হঠাৎ বেশ একটু বিচলিত হয়ে তাঁর ঘরের দরজাটাই বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, আর তাতেই পা লেগে তাঁর গড়গড়া কলকে উল্টে পড়েছে এমন একটা সিদ্ধান্ত কি করা যায় না!

আর সে সিদ্ধান্ত সঠিক হলে আমাদের সঙ্গে ঘনাদার একটা সমব্যথীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না কি?

সম্পর্কের সুতোটা অবশ্য এখনো অতি সূক্ষ্ম। খুব সাবধানে পাকাতে হবে, কারণ একটু চালের ভুল হলেই ছিঁড়ে যেতে পারে।

খুব সাবধানেই পাকটা দেওয়া হয়।

হাহাকারটা সিঁড়িতেই শেষ করে এসেছি। টঙের ঘরে ঢুকে তক্তপোষের ওপর বসবার পর ঘনাদাকে দেখেই যেন মুখে আর কথা ফুটতে চাইছে না।

শিবুই যেন প্রথম কোনো রকমে কথাটা তোলে। হতাশ ভাঙা গলায় বলে,—কালও ঘুম হয়নি ঘনাদা!

ঘুম হয়নি! ঘুম হয়নি!—তিরিক্ষি মেজাজে খিঁচিয়ে ওঠে গৌর,—ভালো লাগেনা রোজ এই প্যানপ্যানানি। খালি নিজের সুখটুকুর ভাবনাই সারাক্ষণ। ঘুম আমাদের কার হচ্ছে শুনি!

আহা শিবুকে মিছিমিছি গাল দিয়ে লাভ কি!—শিশির ক্লান্ত গলায় শিবুকে একটু সমর্থন করে,—শুধু ওর নিজের কথা নয় ও আমাদের সকলের অবস্থাটাই বোঝাতে চেয়েছে। মাথাটা গুলিয়ে আছে বলে কথাটা গুছিয়ে বলতে পারেনি।

থাক! শিবুর হয়ে অতো ওকালতি তোমায় করতে হবে না।—আমি গৌরের পক্ষ নিয়ে গরম হয়ে উঠি,—আমাদের অবস্থা কি শুধু ওই ঘুম-না-হওয়া দিয়ে বোঝাবার। কেন ঘুম হচ্ছে না তার কিছু ঘনাদাকে দেখিয়েছ?

আমি পকেট থেকে একটা চৌকো কার্ড বার করে ঘনাদার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলি—দেখুন ঘনাদা।

গড়গড়াতে টান বা শেলফ হাঁটকাবার মতো কোনো কিছুতে

তন্ময় হবার ভান না করলেও আমরা ঢোকবার পর ঘনাদা বেশ একটু ছাড় ছাড় ভাবই দেখাবার চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু আমি চৌকো কার্ডটা বার করবার পর সে নির্লিপ্ত দূরত্ব আর রাখতে পারেন না।

হাতের যে ছোট আয়নাটা অকারণেই সামনে তুলে রেখে মুখের কিছু যেন দেখবার ছল করছিলেন সেটা তাড়াতাড়ি ফতুয়ার পকেটে রেখে বেশ ব্যস্ত হয়ে কার্ডটা আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন।

তিনি যখন কার্ডটা দেখতে তন্ময় আমরা তখন মনসায় ধুনোর গন্ধ দিতে ত্রুটি করি না।

শিশির যেন সভয়ে বলে—ও কার্ড তুইও তাহলে পেয়েছিস?

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার পকেট থেকে একটা ভিন্ন রঙের অনুরূপ কার্ড শিশির বার করে দেখায়।

শিবু ও গৌর কেউ পেছপাও থাকে না।

আমরাই কি পাইনি!—বলে দুজনেই দুটো কার্ড বার করে তক্তপোষের ওপর মেলে ধরে।

ঘনাদাকে এবার তক্তপোষেরই অন্য প্রান্তে বসে পড়ে কার্ড চারটে মিলিয়ে দেখতে হয়।

চার রঙের হলেও কার্ডগুলো মাপে এক। আর প্রত্যেকটির ওপর এক পিঠে যা আঁকা তা একই ছবির নক্সা।

আর কি সে নক্সা! দেখলেই গায়ে আপনা থেকে কাঁটা দেবার কথা।

কার্ডের তলা থেকে ফণা-তোলা একটা সাপের মাথা উঠে চেরা জিভের সঙ্গে যেন মুখের ভেতর থেকে বিষের হল্‌কা বার করছে।

কার্ডের মাথায় শুধু তিনটি শব্দ লাল হরফে লেখা,—এখনো সময় আছে।

এ সবের মানে কি বলতে পারেন?—কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে শিবু,—ক্রমশঃ তো অসহ্য হয়ে উঠল।

কারুর বিদঘুটে ঠাট্টা টাট্টা হতে পারে ?—আমি যেন হতাশার আশা হিসেবে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করবার চেষ্টা করি।

ধমকও খাই তৎক্ষণাৎ।

ঠাট্টা !—খিচিয়ে ওঠে গৌর,—এই সব ভয়ঙ্কর হুমকিকে ঠাট্টা ভাবছ ! ঠাট্টা হলে স্বয়ং যমরাজই করছেন জেনে রাখো।

হ্যাঁ বেনেপুকুরে ওই ভুল করে একজনদের সর্বনাশও হয়েছে।—শিবু গৌরের সমর্থনে এবার একটা জবর গোছের নজিরই হাজির করে,—এক হপ্তা দু হপ্তা তিন হপ্তা বাড়ির কেউ গ্রাহ্য করেনি, পাড়ার বকা ছেলেদের বাঁদরামি ভেবেই উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর,—

তারপর কি ?—শিবুর নাটকীয়ভাবে থেমে যাওয়ার পর আড় চোখে একবার ঘনাদার দিকে চেয়ে নিয়ে প্রায় বুজে আসা গলায় জিজ্ঞাসা করি,—কি হয়েছে তারপর ?

ওই উড়িয়েই দিয়েছে !—শিবুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

উড়িয়েই দিয়েছে মানে !—আমরা অস্থির হয়ে উঠি,—বকা ছেলের বাঁদরামি বলে উড়িয়েই দিয়েছিল সেই বেনেপুকুর-ওয়ালারা। তাহলে আর হলটা কি ?

উড়িয়ে-দেওয়া জবাবই পেল তাদের আহাম্মকির !—শিবু এবার একটু ব্যাখ্যা করে বোঝায়,—প্রথমে চিলকোঠার ঘরটাই দিলে উড়িয়ে।

চিলকোঠার ঘর !—আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকাই,—তার মানে এই ছাদের ঘরটাই !

শিশির এই শুনেই গরম হয়ে ওঠে অদেখা অজানা আততায়ীদের ওপর,—তা ওড়াতে হলে ছাদের ঘরটাই কেন ? আর ঘর ছিল না সে বাড়িতে —!

ঘর তো ছিলই !—শিবু বুঝিয়ে দেয়—সে সবের কি হবে তার ইসারাও ছিল ওই উড়ে যাওয়া ঘরের বাইরেই পাওয়া একটা চিরকুটে। তাতে লেখা ছিল—যা হবে তার প্রথম নমুনা।

কিন্তু আমাদেরও সেরকম নমুনা দেখাবে নাকি?—আমার মুখখানা ঠিক ফ্যাকাশে না মারলেও গলাটা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠে,—তাহলে ত···

বাকি কথাটা উহ্য রেখে আমি সভয়ে ঘনাদার কাছেই যেন পাদপূরণটা চাই।

ঘনাদা পাদপূরণ করেন না, তবে কার্ডগুলো তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করেন,—এ কার্ডগুলো কবে এসেছে?

আজ্ঞে, একদিনে তো আসেনি।—শিশির ঘনাদাকে সঠিক খবর দেয় ব্যস্ত হয়ে,—প্রথম শিবুর নামে একটা কার্ড আসে ডাকে, আমাদের সেটা দেখাতে আমরা তা নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করেছি। তার পরে পায় গৌর···

ডাকে টাকে নয়!—গৌর রিলে রেসের ব্যাটনের মতো শিশিরের কথার খেই-টা ধরে নেয়,—খেলার মাঠ থেকে বাড়িতে এসে জামা খুলতে গিয়ে এক পকেটে শক্ত মতো কি একটা টের পেলাম। পকেট থেকে বার করে দেখি এই কার্ড।

আমারটা আরো বিশ্রীভাবে পেয়েছি।—গৌর থামতেই শিশির সুরু করে দিতে দেরী করে না,—এই তো আর মঙ্গলবার ন'টার শো দেখে ফিরছি হঠাৎ এই গলির মুখেই 'দাঁড়ান' শুনে চমকে গেলাম। গলির আলোটার অবস্থাতো দেখেছেন। সেই যে কবে বালব চুরি গেছে তারপর থেকে আর করপোরেশনের দয়া হয়নি। জায়গাটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। তারই মধ্যে ইলেকট্রিক পোস্টটার পাশেই দুটি ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে এল। দুজনের গায়ে রেনকোট বা ওভারকোট গোছের কিছু মাথায় টুপিও মুখের ওপর টানা। আমার বেশ কাছে এসে দাঁড়াবার পরও তাদের মুখগুলো দেখতে পেলাম না। শুধু গলার স্বর যা শুনতে পেলাম তাতেই যেন ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে কি দারুণ খাদের গলা। যেন পাতাল গুহা থেকে ভুতুড়ে চাপা আওয়াজ উঠে আসছে। সেই গলাতেই শুনতে পেলাম,—আর পোনেরো দিন মাত্র সময় পাবে, এই নাও তার পরোয়ানা।

এই বলেই আমার হাতে কি একটা দিয়ে ওদিকের অন্ধকারেই যেন মিলিয়ে গেল!

কোনো রকমে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে পৌঁছে আলো জ্বেলে দেখি এই কার্ড!

আর আমার বেলা!—শিশিরের বিবরণটায় উৎসাহিত হয়ে আমি তক্ষুনি শুরু করি,—সে যা হয়েছিল তা ভাবলেই গায়ে এখনো কাঁটা দেয়।

তাহলে এখন আর ভেবে দরকার নেই।—শিবু হিংসুকের মতো আমায় থামিয়ে দিয়ে বলে,—তুইও কার্ড পেয়েছিস এইটুকুই আসল খবর। এখন কথা হচ্ছে,—এগুলো পাঠাচ্ছে কারা?

কারা আবার?—দাঁত খিঁচিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে কি না?—এ কীর্তি আমাদের এই চার জাম্বুবানের!

নিজেরা সব ফলাও করে যে যার গল্প সাজালেন আর আমার বেলাতেই শুধু খবরটাই যথেষ্ট! আমাকে বলতে দিলে নিজেদের গল্পগুলো যে কানা হয়ে যাবে!

এমন হিংসুটেদের সঙ্গে এক দণ্ড আর থাকতে ইচ্ছে করে না, তবু যে থাকি সে নেহাৎ আমার মহানুভবতায়। ওদের হিংসের বিরুদ্ধে আমার মহত্ত্বেরই জয় হয়। এবারও তাই উদার হয়ে ওদের ক্ষমা করে ফেলি শেষ পর্যন্ত!

তবু ফাঁস যখন হয়েই গেছে ব্যাপারটা তখন এখানেই খুলে বলি।

এবারের ষড়যন্ত্র ঘনাদাকেই বাগ মানাবার জন্যে। তবে প্যাঁচটা একটু নতুন আর চালটাও আলাদা।

আগে থাকতে উদ্দেশ্যটা জানাবার দরুন আমাদের অনেক প্ল্যান ঘনাদা এ পর্যন্ত ভেস্তে দিয়েছেন। এবার তাই একেবারে চোরা লড়াই-এর ব্যবস্থা। আমাদের আসল মতলব না জানিয়ে আচমকা হামলায় কাবু করে ফেলব। ঘনাদা ভেবে চিন্তে পিছলে পালাবার সময়ই পাবেন না।

প্ল্যানটা খুব ভালো করেই ছকা হয়েছে। তার প্রথম বুদ্ধিটা এক হিসেবে ঘনাদা নিজেই দিয়েছেন নিজের অজান্তে। সেদিন ছুটির সকালে তাঁর কাছে দুপুরের ভোজের মেনু ঠিক করতে গিয়ে তাঁকে একটু বিচলিতই মনে হয়েছিল! কারণটাও জানতে দেরি হয়নি। হাতের খবরের কাগজটা থেকে অত্যন্ত চিন্তিত মুখ তুলে বলেছিলেন, —জঙ্গল! জঙ্গল! জঙ্গল হয়ে গেল কলকাতা শহর!

রসালো কিছুর আশায় তক্তপোষে চেপে বসে মুখ চোখে যতদূর সাধ্য আতঙ্ক ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি,—কোথায়? কোন্ পাড়ায় ঘনাদা? বাঘটাঘ বেরিয়েছে নাকি? সেই ঝাড়খালির সুন্দরী থুড়ি সুন্দর বাঘ এই কলকাতায়?

বাঘ নয় তার চেয়ে ভয়ঙ্কর জানোয়ার! গম্ভীর মুখে বলেছেন ঘনাদা,—বুঝলে কিছু?

আমরা হাঁ-করা হাঁদা সেজেছি।

মানুষ! মানুষ!—ঘনাদা আমাদের জ্ঞান দিয়েছেন,—এই কলকাতা শহরে তারই উপদ্রব বেড়েছে। এই দেখো না বুড়ো মানুষ পেনসন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির দোর গোড়ায় পিস্তল ছোরা দেখিয়ে তাঁর সব সম্বল কেড়ে নিয়েছে, আর হুমকি দিয়ে আরেক পাড়ায় একটা গলির মুখই দিয়েছে বন্ধ করে। লোকজনকে আধঘণ্টার হাঁটুনি হেঁটে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যেতে হয়।

ঘনাদার বিক্ষোভ শুনতে শুনতে কথাটা একেবারে জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সামলেছি নিজেদের। ঘনাদার কাছে দুপুরের মেনুর ফর্দের সঙ্গে কলকাতার জঙ্গল সম্বন্ধে দামী দামী সব টিপ্পনি শুনে এসেই বসে গিয়েছিলাম আমাদের লক্ষ্যভেদের প্ল্যান ছকতে।

হ্যাঁ এবারেও ঘনাদাকে বাহাত্তর নম্বর থেকে সরানোই আসল লক্ষ্য।

তবে সেই 'ঘনাদাকে ভোট দিন' আন্দোলনের মতো চিরকালের

জন্যে বাহাত্তর নম্বর ছাড়াবার মতলবে নয়, দীঘা কি দার্জিলিঙের দ্বিধার মতো সখের বেড়াতে যাওয়া নিয়ে রেষারেষিও এর মধ্যে নেই। মাত্র মাসখানেকের জন্যে ঘনাদাকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে যেতে পারলেই হয়। অনুরোধটা আমাদের বাড়িওয়ালার আর গরজটা আমাদের নিজেদেরও।

বাড়িটার অনেকদিন ধরে পুরোপুরি সংস্কার হয়নি। খাপছাড়া তালিমারা এখানে সেখানে একটু আধটু মেরামত হয়েছে মাত্র।

আমাদের পেড়াপিড়িতে এই চড়া বাজারেও বাড়িওয়ালা চুন বালি সিমেন্ট দিয়ে পুরোপুরি বাহাত্তর নম্বরের ছাল চামড়া বদলাতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু আধাখেঁচড়া ভাবে সে কাজ তো আর হয় না। তাই পাছে হঠাৎ বেঁকে বসে বাধা দেন এই ভয়ে বাড়িওয়ালা ঘনাদাকে কোনো রকমে মাসখানেকের জন্যে সরাবার অনুরোধ জানিয়েছে।

এ অনুরোধ না রাখলেই নয়, কিন্তু ঘনাদা কি সেই শান্ত সুবোধ ছেলেটি যে একবার সাধলেই সুড়সুড় করে বাহাত্তর নম্বর থেকে বেরিয়ে আসবেন!

ঘাড় তিনি যাতে না বাঁকাতে পারেন তার চাল ভেবে যখন সারা হচ্ছি তখন তাঁর নিজের কাছ থেকেই হদিসটা পেয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, 'কলকাতা মানে জঙ্গল' এই সুরটাই খেলিয়ে ঘনাদাকে কাবু করতে হবে। আর ক্ষুণাক্ষরে আগে থাকতে ঘনাদাকে কিছু না জানিয়ে! বাহাত্তর নম্বর তেমন বিভীষিকা করে তুলতে পারলে উনি 'মানুষ নামে জানোয়ারের' কলকাতা ছেড়ে খোকা বাঘ সুন্দরের ঝাড়খালিতে যেতেও বোধহয় আপত্তি করবেন না। শুধু ভয়টাকে ঠিক মতো পাকিয়ে তুলে একেবারে স্ফুটনাঙ্কে মানে ফুট ধরতেই কথাটা পাড়া দরকার!

তাই জন্যেই এইসব পাঁয়তাড়া। শুধু শিউরে তোলবার ছবি আঁকা কার্ডই নয়, আরো অনেক রকম আয়োজনই হয়েছে। সাপের ছোবল আঁকা কার্ড ঘনাদাও পেয়েছেন স্বীকার করুন আর না করুন।

মাঝ রাত্রে বাইরের দরজায় বিদঘুটে কড়া নাড়াও শুনেছেন সন্দেহ নেই!

হ্যাঁ ওই এক মোক্ষম প্যাঁচ কষা হচ্ছে দু' একদিন বাদে বাদে প্রায় হপ্তা খানেক ধরে।

হঠাৎ মাঝরাত্রে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। প্রথমে আস্তে, তারপর বাড়তে বাড়তে একেবারে পাড়া কাঁপানো আওয়াজ।

কে? কে?—যেন ঘুম থেকে উঠে আমরা বারান্দা থেকেই চিৎকার করি। নেমে যাবার সাহস যেন কারুরই হয় না।

ঘনাদা যে তাঁর টঙের ঘর থেকে বেরিয়ে ন্যাড়া সিঁড়ির ধারে আলসের কাছে দাঁড়িয়েছেন তা টের পেয়ে আমরা আরো একটু হৈ-চৈ বাড়াই।

বনোয়ারী—! বনোয়ারী—! রামভুজ—! রামভুজ—! কোথায় গেল সব ওরা! সাড়া দেয়না কেন?

সাড়া দেবে কোথা থেকে!—আমাদেরই একজনের হঠাৎ যেন স্মরণ হয়।—ওরা যে ক'দিন রাত্রে দেশোয়ালীদের গানের মজলিসে যাবার জন্যে বাসায় থাকছে না সে কথা ভুলে গেছ!

তাহলে?—তাহলে,—শিবু যেন একটু ভেবে আমার দিকে চেয়েই সমস্যাটার সমাধান করে ফেলে,—হ্যাঁ তুই-ই একবার দেখে আয় না নিচে গিয়ে দরজাটা খুলে!

আমি? আমি যাব!—আমায় আর ভয়তরাসের অভিনয় করতে হয় না,—তার চেয়ে,—কি বলে সবাই মিলেইতো গেলে হয়।

প্রথম রাত্রে সবাই মিলেই নেমে গিয়েছিলাম। গিয়ে বড় রাস্তার চায়ের দোকানের ছোকরাটাকে কথা মতো একটা আধুলি দিয়ে, এর পর থেকে এখানে নয় দোকানেই পাওনা মিলবে জানিয়ে ফিরে এসেছিলাম যেন ভয়ে বেসামাল হয়ে।

ওপরে এসে কাঁপা গলায় এলোমেলো এমন আলাপ চালিয়েছিলাম যাতে ব্যাপারটার রহস্য যেমন দুর্বোধ্য তেমনি ভয়ঙ্কর

হয়ে ওঠে।

কই, কেউ মানে কাকেও তো দেখতে পেলাম না!

এতো রাত্রে অমন কড়া নাড়ার মানেটা কি!

এখনো মানে জিজ্ঞাসা করছ? এখনো বুঝতে কিছু বাকি আছে!

তার মানে,—মানে আমাদের এখানে থাকতে দেবে না!

না। আপাততঃ তো নয়।

চুপ চুপ আস্তে!—এর মধ্যে আবার ঘনাদার জন্যে স্পেশ্যাল তীরও ছাড়া হয়েছে—ঘনাদা না রেগে ওঠেন।

ন্যাড়া সিঁড়ির ওপর থেকে ছায়াটা সরে যাবার আভাস পেয়ে মনে হয়েছে প্যাঁচটা নেহাৎ বিফল হয়নি।

ওষুধ যে ধরতে সুরু করেছে তা টের পেয়েছি পরের দিন থেকেই। ঘনাদা তাঁর সন্ধের আসরে যাচ্ছেন না এমন নয়, কিন্তু ফিরছেন একটু বেশী তাড়াতাড়ি। সেই সঙ্গে সারাদিন সদর দরজা বন্ধ রাখা সম্বন্ধে যেন একটু অতিরিক্ত সজাগ হয়ে উঠেছেন।

এ কয়দিনের প্রস্তুতি পর্বের পর আজ হাওয়াটা সব দিকেই অনুকূল মনে হচ্ছে। বক্তার বদলে এমন মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকায় ঘনাদাকে বড় একটা দেখা যায় না।

আপাততঃ এ কাজ কাদের হতে পারে সেই গবেষণাই চলছে!

শিশির বুঝি ওয়াগন ব্রেকারদের কথা বলছিল। কোনো একটা গ্যাং তাদের মালগাড়ি লুটের মাল রাখবার জন্যে এ বাড়িটা হাত করতে চাচ্ছে, এই তার অনুমান!

ছো! বলে এ অনুমান নস্যাৎ করে দিয়ে গৌর তখন বলছে, ওয়াগন ব্রেকার! ওয়াগন ব্রেকার এখানে আসবে কোথা থেকে? কাছে পিঠে রেল লাইন আছে কোনো! উঁহু ওসব নয়।

গৌর তারপর রীতিমতো লোমহর্ষক একটা থিওরি খাড়া করে। তার মতে এ কাজ নিশ্চয়ই কোনো আন্তর্জাতিক গুপ্তচর দলের।

তারা এক ঘাঁটিতে বেশীদিন থাকে না। একবার এখানে একবার ওখানে আস্তানা বদলায়। আর সে আস্তানা যোগাড় করে এমনি হুমকি দিয়ে। তাদের অসাধ্য কিছু নেই, আর মায়াদয়ারও তারা ধার ধারে না! একটা ঘাঁটি যোগাড় করতে দু দশটা জান খরচ তাদের কাছে ধর্তব্যই নয়।

কিন্তু এদের কাজটা কি? কি করে এরা! বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করি আমি!

কি না করে!—গৌর যেন সামনে মাইক ধরে বলে যায়,—এই যে দেশে এত গণ্ডগোল, এতো সমস্যা, চুরি ছিনতাই রাহাজানি, নিশানে নিশানে হানাহানি লাল নীল কালোবাজার ঘাটতি বাড়তি উঠতি পড়তি রকবাজ সাবোটাজ পুরো দামে কম কাজ ধর্মঘট লক আউট তুফান খরা বন্যা চাল তেল কয়লার জন্যে ধরনা এ সব কিছুর মূল হল তারা। দেশটার আখের যাতে মাটি হয় তাই সারাক্ষণ তুর্কি নাচন নাচিয়ে সব কিছু ভণ্ডুল করে দেওয়াই তাদের মতলব।

তা এমন একটা গুপ্তচরের দলের কথা ঘনাদা কি আর জানেন না!

কথাটা বলে ফেলেই নিজের আহাম্মুকিটা বুঝতে পেরে মনে মনে জিভ কাটি।

এই এক ছুতো পেয়ে ঘনাদা একটি গল্প ফেঁদে বসলেই তো সর্বনাশ! আমাদের আসল উদ্দেশ্যই তাহলে মাটি। আজ ঘনাদার কাছে গল্প তো চাইনা, চাই তাঁকে বেশ একটু ভড়কে দিয়ে বাহাত্তর নম্বরটা ক'দিনের জন্যে ছাড়াতে।

আমার ভুলে এতো কষ্টের আয়োজনের পর ঘাটের কাছে বুঝি ভরাডুবি হয়।

গৌরই সে বিপদ থেকে বাঁচায় অবশ্য।

ঘনাদা এই ছুতোটাই ধরতেন কি না জানি না। কিন্তু তিনি মুখ খোলবার আগেই গৌর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে

ওঠে,—ঘনাদা জানবেন মানে? এ কি ওপারের সেই সব বনেদি কোনো দল! নেহাৎ চ্যাংড়া গুপ্তচরদের মহলের সেদিনকার উঠতি মস্তান বলা যায়! ঘনাদারই এখনো নাম শোনে নি! তা না হলে বাহাত্তর নম্বরে মামদোবাজি করতে আসে!

সেজন্যেই ভাবছি,—একটু থেমে গৌর যেন গভীরভাবে কি ভেবে নিয়ে বলে,—এই সব চ্যাংড়াদের যখন বিশ্বাস নেই তখন দু-চারদিন মানে মানে একটু সরে গেলে বোধহয় মন্দ হয় না। ওদের দৌরাত্মিতো মাসখানেকের বেশী নয়। তার মধ্যে নিজেরাই খতম হয়েও যেতে পারে। সেই মাসখানেক একটু চেঞ্জে ঘুরে এলে ক্ষতি কি? তাও দীঘা কি দার্জিলিঙ নয়, এই ডায়মণ্ড হারবারে। গাঙের ধারে বাড়িটা মিনিমাগনা পাচ্ছি।

আমরা সবাই সোৎসাহে সরবে এ প্রস্তাব অনুমোদন করি।

বলিস কি! ডায়মণ্ড হারবারে এমন বাড়ি!

গাঙের ধার মানে তো মিনি সমুন্দুর!

আর এক পা বাড়ালেই তো ডায়মণ্ড হারবার। যাওয়া আসার কোনো হাঙ্গামাই নেই।

তাছাড়া ওখানকার টাটকা মাছ! তপসে পারশে ভেটকি ভাঙন আর ইলিশ গুড়জাওয়ালী একবার মুখে দিলে আর ডায়মণ্ড হারবার ছাড়তে ইচ্ছে হবে না।

গদগদ উচ্ছ্বাসের মধ্যে ঘনাদার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতেও ভুলি না।

না, বেয়াড়া কোনো লক্ষণ সেখানে দেখা যায় না। একটু গম্ভীর যেন একটু ভাবিত। তা সেটাতো স্বাভাবিক।

জো বুঝে আসল কথাটা পেড়ে ফেলে শিশির,—কাল সকালেই তা হলে রওনা হচ্ছি ঘনাদা! যত তাড়াতাড়ি পারি বেরিয়ে পড়ব। আপনি তো খুব ভোরেই ওঠেন।

ঘনাদা উত্তরে শুধু বলেন,—হ্যাঁ তা উঠি।

ব্যাস! এর বেশী আর কি ভাবে মত দেবেন ঘনাদা! আমাদের

মতো দু বাহু তুলে ধেই ধেই করে নৃত্য করবেন নাকি? স্পষ্ট হ্যাঁ তিনি বলেন নি কিন্তু 'না তোও' তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় নি।

আমরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নিচে নেমে যাই। সারাদিন তোড়জোড় চলে বাহাত্তর নম্বর ছাড়বার। ঘনাদার সঙ্গে আর কোনো আলাপ আলোচনায় ঘেঁসি না, পাছে কোনো ভুল বোলচালে পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়।

ঘনাদাকে একবার বিকেলের দিকে বেরুতে দেখি। ফেরবার সময় মুখটা যেন হাসি হাসি মনে হয়। আর আমাদের পায় কে?

মাঝরাত্রে সেদিন বাইরের কড়া নাড়াটা শুধু একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়, অত্য শেষ রজনী বলে।

পরের দিন সকালে জিনিষপত্র গুছোনো বাঁধাছাঁদার মধ্যেই একবার ঘনাদাকে দেখে আসা উচিত মনে হয়। যাবার আগে কোনো সাহায্য টাহায্যতো দরকার হতে পারে।

কিন্তু ন্যাড়া সিঁড়ি দিয়ে ছিলের ছাদ পর্যন্ত উঠেই যে পা দুটো সেখানে জমে যায়। টঙের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে তা কি সত্যি না দুঃস্বপ্ন!

ঘনাদা নিশ্চিন্ত নির্বিকার হয়ে তাঁর খাটো ধুতির ওপর ফতুয়াটি গায়ে দিয়ে এক হাতে গড়গড়ার নল ধরে টান দিতে দিতে তক্তপোষের ওপর উবু হয়ে বসে কাগজ পড়ছেন!

এ কি ঘনাদা!—ভেতরে গিয়ে এবার বলতেই হয় হতভম্ব হয়ে,—ভুলে গেছেন নাকি?

ঘনাদা কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বেশ মধুর কণ্ঠে আমাদের আশ্বাস দেন,—না, ভুলব কেন।

তবে এখনো তৈরী হননি যে?—আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

হইনি, দরকার নেই বলে।—ঘনাদার দৃষ্টি এখনো খবরের কাগজের ওপর,—গানটা দিয়ে দিলাম কি না।

গানটা দিয়ে দিলেন!—তক্তপোষের ধারে আমাদের বসতে হয় এবারে কিন্তু খুব সানন্দে সাগ্রহে নয়।

বিস্মিত প্রশ্নটা কিন্তু আপনা থেকেই গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল,—গান দিয়ে দিলেন কাকে? কেন?

কেন দিলাম!—এতক্ষণে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ঘনাদা আমাদের ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করলেন—না দিলে এ সব উৎপাত বন্ধ হয় না যে। আর দিলাম মাৎসুয়ো-কে।

কে এক মাৎসুয়োকে কি গান দিলেন আর তাইতে সব উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে বলে আমাদের আর কোথাও যাবার দরকার নেই বলছেন!

আমরা ঘুরপাক খাওয়া মাথাটাকে একটু থামাবার চেষ্টা করে প্রথম রহস্যটাই জানতে চাইলাম—মাৎসুয়ো আবার কে?

ঘনাদা যেন অপ্রস্তুত হয়ে একটু হাসলেন।

ও, মাৎসুয়ো কে তা তো তোমরা জানো না। কিন্তু মাৎসুয়োর পরিচয় দিতে হলে ইয়ামাদোর কথাও বলতে হয়, আর যেতে হয় প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় মাঝামাঝি টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে এমন দুটি ফুটকিতে সাধারণ মাপে অনুবীক্ষণ দিয়েও যাদের পাত্তা পাবার নয়। নাম লিমু আর নিফা, ঠিক কুড়ি অক্ষাংশের দুধারে একশ চুয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর দ্রাঘিমার মধ্যে দুটি ছেলেখেলার দ্বীপ। একটি দু মাইল আর অন্যটি বড় জোর দেড় মাইল লম্বা কিন্তু এই মহাসমুদ্রে এই দুটি মাটির ছিটে নিয়েই মাৎসুয়ো আর ইয়ামাদোর মধ্যে কাটাকাটি ব্যাপার। লিমু দ্বীপটা মাৎসুয়োর আর নিফার মালিক ইয়ামাদো। গত মহাযুদ্ধের সময় দুজনেই জাপানের নৌ-বাহিনীতে ছিল। ওই অঞ্চলেই যুদ্ধের কাজে থাকতে হয়েছিল বলে দুজনেই ওই দ্বীপমালার রাজ্যকে ভালবেসে ফেলে। যুদ্ধ থামবার পর দেশে ফিরেও সে ভালবাসা তারা ভোলে না। কিছুকাল ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ কিছু রোজগার করে দুই-বন্ধুই ওই অঞ্চলে গিয়ে পাশাপাশি দুটি দ্বীপ কেনে।

দুজনের বন্ধুত্বে সেইখানেই দাঁড়ি। নিজের নিজের দ্বীপকে একেবারে অতুলনীয় স্বর্গ বানিয়ে ফেলার রেষারেষিতে দুজনেই যেন দুজনের মাথা নিতেও পেছপাও নয়।

ঠিক সেই সময় আমার সঙ্গে মাৎসুয়োর দেখা। দেখা না বলে ঠোকাঠুকিই বলা উচিত। জাপানের হোক্কাইদো দ্বীপের পাহাড়ে তুষার ঢাল দিয়ে সে রাত্রে মশাল হাতে নিয়ে আমি স্কি করে নামছি।

কি করে নামছেন?—শিবুর প্রশ্নটার ধরনে ভক্তিভাবের একটু যেন অভাব মনে হল।

স্কি করে—ঘনাদা প্রশান্তভাবেই বলে চললেন—রাত্তিরে মশাল নিয়ে স্কি করায় একটা আলাদা উত্তেজনা আছে। জাপানে মশাল নিয়ে স্কি করার তাই খুব উৎসাহ। তবে দক্ষিণের সব স্কি-ঘাঁটিতে এ খেলা চললেও ঢাল একটু বেশী আর বিপদজনক বলে হোক্কাইদো-তে মশাল নিয়ে স্কি কেউ বড় করে না।

মশাল নিয়ে মনের আনন্দে নামতে নামতে সেই জন্যেই বেশ একটু অবাক হচ্ছিলাম কিছুক্ষণ থেকে। আমার পেছনে মশাল নিয়ে আরেকজন কে যেন নেমে আসছে। আর নামছে রীতিমত বেগে। হোক্কাইদোর তুষার পাহাড়ের ঢাল রাত্তিরবেলা একেবারে নির্জন। অন্য কোথাও হলে এক আধজন স্কিয়ার তবু দেখা যায়। এখানে ওপরের লজ কেবিন পর্যন্ত বন্ধ। স্কি লিফট্ নেই বলে আমি সিঁড়ি-পা ফেলে ফেলে পাহাড়ের মাথায় উঠেছি। আমার মতো এই রাত্রে স্কি করবার বেয়াড়া সখ আবার কার!

কিন্তু সখই শুধু বেয়াড়া নয়, লোকটা যে একেবারে রাম আনাড়ি মনে হচ্ছে। নামছে একেবারে পাগলা ঘোড়ার মতো, কিন্তু কোথায় নামছে তার যেন ঠিক নেই। এত চওড়া তুষার ঢাল পড়ে থাকতে আমারই ঘাড়ের ওপর পড়তে যাচ্ছে যে!

গোঁয়ার্তুমি করে এই রাত্রে স্কি করতে নেমে এখন তাল সামলাতে পারছে না নাকি? সত্যিই পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লেতো সর্বনাশ। দুজনের শরীরে স্কি আর চাকা লাঠিতে জড়ামড়ি হয়ে

গড়াতে গড়াতে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাব যে !

এ বিপদ এড়াবার জন্যে যা যা সম্ভব সবই করলাম। প্রথম স্টেম বোগেন নিলাম।

কি নিলেন! স্টেন গান?—আমাদের হাঁ-করা মুখের প্রশ্ন,—গুলি করবার জন্যে!

না, স্টেন গান নয় স্টেম বোগেন!—ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন একটু—ওটা হল স্কি করার সময় এক রকম বাঁক নেওয়া। মোঙ্গল আর ল্যাপ্‌দের কাছে বিদ্যেটা শিখলেও নরোয়ে সুইডেনই প্রথম স্কি-টা ইউরোপে চালু করে বলে শব্দটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান।

আমাদের জ্ঞান দিয়ে ঘনাদা আবার তাঁর বিবরণ সুরু করলেন—স্টেম বোগেন-এ খুব সুবিধা হল না। লোকটার আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়াই যেন নিয়তি।

কিন্তু সত্যি কি তাই?

স্টেম বোগেনের পর স্টেম ক্রিষ্টিয়ানা বাঁক নিলাম, কিন্তু লোকটা তখনও যেন আটার মতো পেছনে লেগে আছে। যে রকম আনাড়ি তাকে ভেবেছিলাম তা ও তো সে নয়। শক্ত শক্ত উৎরাই-এর ঢাল আর বাঁক বেশ ভালোই সামলাচ্ছে। মরিয়া হয়ে নামছে বলে প্রায় ধরেও ফেলেছে আমায়।

তাহলে আমায় জেনে শুনে জখম কি খতম করা কি তার মতলব? কেন? লোকটাই বা কে?

এ সব প্রশ্নের জবাব ভাববার তখন সময় নেই, যেমন করে হোক লোকটার মতলব ভেস্তে দিতে হবে।

তাই দিলাম। পর পর দুটো স্টেম বোগেন আর স্টেম ক্রিষ্টিয়ানা বাঁক নিয়ে তাকে ছেড়ে ফেলতে না পেরে ওই শক্ত তুষারেই নরম তুষারের সুইস টেলেমার্ক বাঁক নিয়ে ঘুরেই লাঙ্গল-পা করে থেমে গেলাম।

লোকটা আমায় একেবারে গা ঘেঁসে ছিটকে গিয়ে খানিক-দূরে ঘাড় মুখ গুঁজে পড়ল।

ভাবলাম ঘাড় ভেঙে শেষই হয়ে গেল বুঝি। কিন্তু তা হয়নি। খুব কড়া জান। হাড়গোড় ভাঙা নয় একটা পা মচকানোর ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা গেছে।

ধরে টরে কোনো রকমে তুললাম। এখন তাকে নিচে নিয়ে যাওয়াই সমস্যা।

কিন্তু নিয়ে যাব কাকে? খোঁড়া হয়েও লোকটার কি রোক! আর আমারই ওপরে।

জাপানীতে সে যা বললে বাংলার চেয়ে হিন্দীতে বললেই তার ঝাঁঝটা বুঝি একটু ভালো বোঝানো যায়।

তাকে ধরে তোলবার আগে থেকেই সে আমার ওপর তম্বী সুরু করেছে। তুমকো হাম খুন করেঙ্গে, মারকে কুত্তাকো খিলায়েঙ্গে!—এই হল তার বুলি।

ব্যাপারটা কি? লোকটা পাগল টাগল নাকি!

না, তাতো নয়। মশালটা ভালো করে মুখের কাছে ধরতে মুখটা চেনা চেনাই লাগল। সঠিক মনে পড়ল তার পরেই।

হ্যাঁ, টোকিওর উয়েনো স্টেশন থেকে রওনা হবার সময় ছুটির দিন পড়ায় স্কিয়ারদের দারুণ ভিড় হয়েছিল। কলেজের ছেলে মেয়ে আর কমবয়সী চাকরদের ভিড়ই বেশী। স্কি নিয়ে তারা সবাই জাপানের কোনো না কোনো স্কি রেজর্ট-এ যাচ্ছে। ট্রেন আসবার পর ঠেলাঠেল করে ওঠবার সময় কে যেন পেছন থেকে আমায় টেনে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল। তখুনি ফিরে চেয়ে হাতে নাতে কাউকে ধরতে পারিনি কিন্তু এই মুখটাই যেন তার ভেতর দেখেছিলাম মনে হচ্ছে।

শুধু উয়েনো ষ্টেশনে কেন তার আগে আরো দু-তিন জায়গায় এই মুখটা দেখেছি বলে মনে পড়ল। লোকটা যেন বেশ কিছুকাল ধরে আমার পিছু নিয়েছে। কেন?

দুটো স্কিকে জুড়ে একটা স্ট্রেচার গোছের বানিয়ে তার ওপর লোকটাকে শোয়াবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে ফেলেছি। সেই অবস্থায়

তাকে তুষারের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম, – কে তুমি ? আমার পিছু নিয়েছ কেন ?

ওই অবস্থাতেই লোকটা গজরে উঠল,—তোমায় খুন করবার জন্যে !

বেশ সাধু উদ্দেশ্য !—হেসে বললাম,—কিন্তু খুন করাই যদি তোমার নেশা হয় এই মহৎ কাজটার জন্যে আমার চেহারাটাই পছন্দ হল কেন ! এ পৃথিবীতে তো শুনি তিনশো কোটি মানুষ গিজ গিজ করছে। তাদের কাউকে মনে ধরল না।

না, তুমিই আমার একমাত্র শত্রু ! – সে দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মতো হিসহিসিয়ে উঠল, – ইয়ামাদোর সঙ্গে মিলে তুমি আমার কি সর্বনাশ করেছ জানো না।

ও, তুমি তাহলে মাৎসুয়ো ! লিমু দ্বীপের মালিক ! – এতক্ষণে অন্ধকারে আলো দেখতে পেলাম, – কিন্তু তোমায় তো আমি কখনো চোখেও দেখিনি, তোমার লিমুতেও কখনো পা দিইনি।

তা দিলে তো তোমায় কুচি কুচি করে কেটে হাঙরদের খাওয়াতাম ! – মাৎসুয়ো যেন মুখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা ছাড়ল, – তুমি লিমুতে আসোনি কিন্তু ইয়ামাদোর হয়ে তার নিক্ষা থেকে কি বিষ মন্তর ঝেড়ে আমার সোনার লিমু ছারখার করে দিয়েছ ! জানো ! আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম আর ইয়ামাদো তো নেহাৎ চাষার ছেলে। আমি বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমার লিমুকে মর্ত্যের স্বর্গ বানিয়ে তুলেছিলাম ! সেই স্বর্গ তুমি শ্মশান করে দিয়েছ।

তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলে ! – একটু হেসেই বললাম, – হ্যাঁ, ইয়ামাদোর অনুরোধে একবার তার দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে তোমার সঙ্গে তার রেষারেষির কথা শুনেছিলাম বটে। তোমার নামটাও সেই সময়ে শুনি আর তুমি যে তোমার লিমুকে নন্দন কানন বানাবার জন্যে যা কিছু সম্ভব বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছ সে খবরও পাই। তখনই তোমার সম্বন্ধে তোমাদেরই একটা জাপানী প্রবাদ আমার মনে এসেছিল, – 'স্বঙ্গো ইয়োমি নো রঙ্গো শিরজু !' এখন আমার বিরুদ্ধে

তোমার আক্রোশের কারণ শুনেও সেই প্রবাদই আবার শোনাচ্ছি,—
'রঙ্গো ইয়োমি নো রঙ্গো শিরজু।'

তখন তুষার পাহাড়ের ঢাল থেকে নিচের বসতিতে পৌঁছে গেছি। সেখানে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে তুলে মাৎসুয়োকে হাসপাতালে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করলাম। তার জন্যে যাই করি মাৎসুয়ো কিন্তু তখনো আমার ওপর সমান খাপ্পা। তার ক্যাবিন থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় গলায় যেন বিষ ঢেলে বলল,—পা খোঁড়া হয়েছে বলে তুমি আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে ভেবেছ! আমি অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে হোকাইদোর স্কি-ঘাঁটিতে যেমন তোমায় খুঁজে বার করেছি তেমনি যেখানেই যাও তোমার নিশ্চিত শমন হয়ে দেখা দেবই এই কথাটি মনে রেখো।

আমি তাহলে তোমাদের প্রবাদটাই এবার আমার বাংলা ভাষায় বলি মাৎসুয়ো।—বেশ একটু গম্ভীর হয়েই বললাম,—তোমার বেদ মুখস্থ কিন্তু বুদ্ধি ঢু ঢু। তোমার নিজের সর্বনাশ তু'ম নিজেই করেছ এইটুকু শুধু শুধু বলে যাচ্ছি আর কথাটা যদি ধাঁধা মনে হয় তাহলে তার উত্তর বার করবার জন্যে ক'টা ইসারাও দিয়ে যাচ্ছি,—তোমার আখের ক্ষেত, বুফো ম্যারিনাস আর বছরে চল্লিশ হাজার।

এই বলেই চলে এসেছিলাম হোক্কাইদো থেকে। তারপর এতকাল বাদে গোড়িয়াহাট মোড়ে কাল বিকেলে আবার দেখা। না সে মাৎসুয়ো আর নেই। ভাবনায় চিন্তায় দুনিয়াভর টহলদারির ধকলে পাকা আম থেকে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। সে ক্ষ্যাপা নেকড়েও এখন একেবারে পোষা খরগোস। আমায় দেখে রাস্তার ওপরই পায়ের ধুলো নেয় আর কি!

পায়ের ধুলো! মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েই গেল,—জাপানীরা আজকাল আবার পায়ের ধুলো নিতে শিখেছে নাকি।

আহা মাৎসুয়ো আর কি জাপানী আছে নাকি!—ঘনাদা ঝটপট সামলে নিলেন,—এ বাংলা ও বাংলায় আমায় খুঁজতে খুঁজতে আধা নয় চৌদ্দ আনাই বাঙালী হয়ে গেছে। ওই তোমাদের মতোই প্রায় চেহারা।

ঘনাদা আমাদের চেহারাগুলো একবার যেন 'চেক' করে নিয়ে
আবার শুরু করলেন,—আফসোসেরও তার সীমা নেই, আমাকে
মিছিমিছি শত্রু না মনে করলে কত আগেই তার সব মুশকিল আসান
হয়ে যেত সেই কথা ভেবেই তার বেশী দুঃখ। আমি যে তিনটে
ইসারা দিয়েছিলাম তাই থেকেই সে তার লিমু দ্বীপের অভিশাপের
রহস্য বার করে ফেলে। কিন্তু তার নিজের অতি বুদ্ধির প্যাঁচই এখন
তার নাগপাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে বলতে মাৎসুয়ো রাস্তায়
দাঁড়িয়েই হাঁফাচ্ছিল। চীনে হলে হবে না, জাপানী রেস্তোরাঁই বা
কোথায় পাব। সামনে যে ময়রার দোকান পেলাম তাতেই নিয়ে
গিয়ে বেশ একটু ভালো করে মাৎসুয়োকে কচুরি সিঙাড়া খাইয়ে
চাঙ্গা করে তুললাম।

ঘনাদা থামলেন। ইঙ্গিতটাও মাঠে মারা গেল না। আমরাও
বুঝলাম। বাহাত্তর নম্বর থেকে ঠাঁই বদল যখন হবেই না তখন
মিছে আর মেজাজ বিগড়ে থেকে লাভ কি! আমাদের দিক দিয়ে
অনুষ্ঠানের ত্রুটি যাতে না থাকে শিশির তাই চট করে একবার নিচে
থেকে ঘুরে এল। তারপর চ্যাঙাড়ি ভর্তি কচুরি সিঙাড়া তো এলোই,
টিন ভর্তি সিগারেটও।

ঘনাদা কেমন অন্যমনস্কভাবে গোটা কৌটোটাই হাতাবার সঙ্গে
সঙ্গেই অর্ধেক চ্যাঙারি ফাঁক করে যেন মাৎসুয়োর ক্ষিদের বহরটাই
আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। তারপর শিস-দেওয়া কৌটো খুলে
শিশিরকে উদার হয়ে একটা বিলিয়ে আর নিজে একটা ধরিয়ে
লম্বা টান দিয়ে নতুন করে সুরু করলেন,—হ্যাঁ মাৎসুয়োর দুঃখের
কাহিনী শুনে এবার বলতেই হল, আসলে ওই বুফো ম্যারিনাসই যে
তোমার লিমু দ্বীপের কাল তা এখন বুঝেছ তো? ইয়ামাদোর নিফা
দ্বীপে অতিথি হবার সময়েই আখের ক্ষেতের নারকুলে পোকা মারতে
তোমার এই বুফো ম্যারিনাস আমদানির কথা শুনে আমি রঙ্গো
য়োমি নো রঙ্গো শিরজু বলে তোমাদের প্রবাদটা আওড়েছিলাম।
তাই এটা পুকুরের বোয়াল মারতে খাল কেটে কুমীর আনার

সামিল আর বেদ মুখস্থ বুদ্ধি ঢু ঢু-র দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে গিয়ে তুমি মূর্খের মতো বেঅকুবি-ই করেছ। তোমার আমদানি-করা বুফো ম্যারিনাস এসে প্রথমে আখের ক্ষেতের সব পোকা ঠিকই সাবাড় করেছে, তারপর হয়ে উঠেছে রূপকথার সেই অজর অমর রাক্ষসীর পাল। রক্তবীজের মতো দিন দিন বেড়ে এরা তোমার গোটা লিমু দ্বীপটাকেই পেটে পুরতে চলেছে। লম্বায় এরা আধ হাতেরও ওপরে ওজনে কম সে কম সওয়া কিলো। ভালো মন্দ সব পোকামাকড় শেষ করেও এদের ক্ষিদে মেটে না, খাবার মতো সাপ ব্যাঙ যা পায় এরা অম্লান বদনে গিলে ফেলে। এদের গায়ের গ্রন্থির এক রকম রসে কুকুর বেড়াল মারা যায় আর বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার গুণ বেড়ে এরা যেখানে থাকে সেই জায়গাই শ্মশান করে তোলে।

আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন।—আমার কথার পর ককিয়ে উঠল মাৎসুয়ো। ওই বুফো ম্যারিনাস-ই সব সর্বনাশের মূল জানবার পর আমি আমার সমস্ত লোকজন নিয়ে দ্বীপ থেকে তাদের নির্মূল করবার আয়োজন করেছি। কিন্তু অমন করে মেরে ক'টাকে শেষ করা যায়! বছরে চল্লিশ হাজার যারা ডিম পাড়ে, তাদের একশটা যখন মারি তখন হাজারটা নতুন করে জন্মায়। নিরুপায় হয়ে আমি টোঙ্গা সামোয়া থেকে ভাড়া করা ধাঙড় আনালাম। একটা বুফো মারলে দশ টাকা। কিন্তু তাতেও রক্তবীজের ঝাড় বেড়েই যাচ্ছে। একেবারে হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত আপনার খোঁজেই এসেছি, এ অভিশাপ কাটাবার উপায় কিছু আছে কি না জানতে। তা যদি না থাকে তো লিমুতে আর ফিরব না। একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব।

নিরুদ্দেশ তোমায় হতে হবে না মাৎসুয়ো!—একটু সান্ত্বনা দিয়ে এবার বললাম,—এ সমস্যা তোমার শুধু ওই লিমু দ্বীপের নয়। অস্ট্রেলিয়ার মতো বিরাট দেশও আজ এই সমস্যা নিয়ে দিশাহারা। তবে হতাশ হোয়ো না। উপায় আছে। একমাত্র গান দিয়েই তোমার লিমুকে এখন বাঁচানো যায়।

গান!—আমাদের সকলের চোখই ছানাবড়া,—গান দিয়ে লমুকে বাঁচাবেন!

হ্যাঁ, মাৎসুয়োও ওই প্রশ্ন করেছিল,—অবোধকে বোঝাবার হাসি হাসলেন ঘনাদা,—তাকে তাই বলতে হল যে ওষুধপত্র গুলিবারুদ কোনো কিছুতে কিছু হবে না। বুফো ম্যারিনাসের সমস্যার ফয়সালা যদি কিছুতে হয়ত গানে-ই হবে। চৌরঙ্গির একটা বড় রেডিও গ্রামোফোন ইত্যাদির দোকানে তাকে নিয়ে গিয়ে টেপ রেকর্ডে খানিকটা গান তুলে দিয়ে বললাম,—যেটুকু মনে আছে তাতে এই টেপটুকু যেমনভাবে বলে দিচ্ছি সেইভাবে বাজালেই কাজ হাসিল হবে বলে বিশ্বাস। নির্দেশগুলো তারপর একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। মাৎসুয়ো কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে আজ কালের মধ্যেই লমুর জন্যে রওনা হবে সুতরাং আর কোনো উপদ্রবের ভয় নেই।

তা তো নেই, কিন্তু বুফো ম্যারিনাস কি বস্তু আর আপনি সব সঙ্কট মোচন যে টেপটি তাকে দিলেন সেটি কিরকম গানের?

বুফো ম্যারিনাস হল এক জাতের কোলা ব্যাঙ।—ঘনাদা সদয় হয়েই আমাদের বোঝালেন,—আদি জন্ম দক্ষিণ আমেরিকায়। সেখান থেকে হাওয়াই ঘুরে অস্ট্রেলিয়ায় আমদানি হয়েই সর্বনাশ করতে সুরু করেছে। টেপে তুলে যে গানটা মাৎসুয়োকে দিলাম সেটা এই ব্যাঙ বাবাজি বুফো ম্যারিনাস-এরই বিয়ের গান বলতে পারো। মদ্দা ব্যাঙ গলা ফুলিয়ে এই গান গাইলে তার টানে দলে দলে কনে ব্যাঙেরা সব হাজির হয়। সুবিধে মতো জায়গায় এ গান বাজিয়ে তাই চল্লিশ হাজারী ডিমের ব্যাঙ-বৌদের ধরে কোতল করা যায়। কিছুদিন একাজ করতে পারলেই বুফো ম্যারিনাস-এর সব নির্বংশ।

কিন্তু ওই কোলা ব্যাঙের বিয়ের গান আপনি গাইলেন কি করে!

ঠিক কি আর গাইতে পেরেছি!—ঘনাদা বিনয় দেখালেন,—তবে দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোরবার সময় বনে বাদাড়ে শুনে যেটুকু মনে ছিল তাই একটু গেয়ে দিয়েছি। ওতেই অবশ্য কাজ যা হবার হবে।

ব্যাঙ বয়েরাও সবাই নিশ্চয় কালোয়াত নয়।

কিন্তু—আমাদের প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি—আপনার ওই মাৎসুয়ো আপনার ওপর অত ভক্তিমান হয়ে উঠবার পরও অমন ভয় দেখানো কার্ড পাঠাচ্ছিল কেন?

ওটা ভয়ে! ভয়ে!—ঘনাদা যেন স্নেহের প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন,—প্রথমেই সোজাসুজি আমার কাছে আসতে সাহস করেনি তাই আগেকার ধরনটাই রেখে তারই ভেতর আমায় পরীক্ষা করে দেখবার কায়দা করেছিল। আমি অবশ্য গোড়াতেই কার্ডগুলো দেখেই বুঝেছিলাম। ওতে ছবিগুলো ভয়ের কিন্তু সেই সঙ্গে মাৎসুয়োর নামটাও জাপানী গুপ্ত হরফে লেখা।

তাই লেখা নাকি!

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বেশ একটু ঘুরপাক খাওয়া মাথা নিয়েই নিচে নেমে গিয়েছি এরপর। এ অবস্থায় শিশিরের সিগারেটের গোটা টিনটা-ই ফেলে আসা খুব স্বাভাবিক নয় কি?

শেষ চমকটা অবশ্য তখনো বাকি ছিল।

বড়রাস্তায় চায়ের দোকানে গিয়েই সেটা পেলাম। সেখানকার চা-পরিবেশনের ছোকরাকে সেদিন থেকে আর রাত্রে কড়া না নাড়বার কথা জানাতে গেছলাম।

তার দরকার হল না।

আমাদের দেখেই একটু বিষণ্ণ মুখে বেরিয়ে এসে সে বললে,—আজ থেকে আর মাঝরাত্রে কড়া নাড়তে হবে না তো বাবু!

না, হবে না। কিন্তু তোমায় বললে কে?

আজ্ঞে ওই আপনাদের বড়বাবু! কাল বিকেলে আর ক'দিন একাজ করতে হবে জানতে যাচ্ছিলাম। উনি তখন বেড়াতে বার হচ্ছেন। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করতে জানিয়ে দিলেন যে আজ থেকে কড়া নাড়া বন্ধ।

সকালে একবারের বেশী চা আমরা কেউ খাই না। কিন্তু এরপর ওইখানেই বসে পড়ে পর পর কড়া করে দু কাপ না গলায় ঢেলে আর উঠতে পারলাম না।

উপমাটা কী দেব ভেবে পাচ্ছি না।

আহ্লাদে আটখানা হয়েই বোধ হয় কথা যোগাচ্ছে না মাথায়: তাই বেড়ালের শিকে ছেঁড়া, না মরা গাঙে বান ডাকা, কোন্‌টা জুতসই হবে ঠিক করতে দেরি হচ্ছে।

যাক্‌, গুলি মারো উপমায়! আসল কথাটা শোনালেই যখন নেচে উঠতে হবে, তখন উপমার কী দরকার? আর নেহাত যদি উপমা না দিলে মান থাকে না মনে হয়, তাহলে র‍্যাশনে যেন মিহি চাল পুরো দিয়েছে বলতে দোষ কী?

ব্যাপারটা অবশ্য র‍্যাশনে মিহি চাল পাওয়ার চেয়েও খুশিতে ডগমগ করবার। বাহাত্তর নম্বরের তাই প্রায় সবাই হাজির টঙের ঘরে।

বাহাত্তর নম্বর বলতেই রহস্যটা বোঝা গেছে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, অনুমানটা কারুরই ভুল নয়। ঘনাদা সত্যিই সদয় হয়েছেন।

আবহাওয়ার এই অভাবিত পরিবর্তনটা সকালবেলাতেই টের পেয়েছি। বেশ একটু ভয়ে ভয়েই গৌর আর আমি সকালবেলা একবার হালচালটা বুঝে নিতে টহলদারিতে এসেছিলাম। ক'দিন ধরে যা খরা যাচ্ছে তাতে বৃষ্টি তো বৃষ্টি, একটু মেঘের টুকরোও দেখবার আশা অবশ্য করিনি।

কিন্তু ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে টঙের ঘর পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই বুকগুলো দুলে উঠেছিল। না, বৃষ্টি তখনো না পড়ুক, আকাশ যাকে বলে মেঘমেদুর। ধান একটু মাপতে না মাপতেই ঝেঁপে নেমে আসবে মনে হয়।

ঘনাদা ঘরের মধ্যে অন্যদিনের মতো তাঁর জগদ্দল কাশীরাম দাসে মুখ গুঁজে বসে নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের ওপরেই পায়চারি করছেন।

ঘনাদার ছাদে পায়চারি! এমন দৃশ্য আগে তো কখনো কেউ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ পায়চারির অর্থ কী? আর লক্ষণটা শুভ, না অশুভ? কিছুই ঠিক বুঝতে না পেরে একটু উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞাসা করেছি—হয়েছে কী ঘনাদা?

হয়েছে?—যেতে যেতে ঘনাদা ফিরে দাঁড়িয়েছেন।

ব্যস! ওই ফেরাটুকুতেই যা বোঝবার আমরা বুঝে নিয়েছি। বুক আমাদের তখনই দশ হাত।

যেটুকু ধন্দ ছিল, ঘনাদার পূরণ করা বাক্যাংশেই তা দূর হয়ে গিয়েছে।

না হয়নি তো কিছু?—ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর কথাটা শেষ করেছেন ঘনাদা—একটু যুদ্ধের কথা ভাবছিলাম।

যুদ্ধের কথা ভাবছিলেন ঘনাদা!

শুনেই 'কেল্লা ফতে!' বলে চিৎকার যে করিনি, সে আমাদের কঠোর আত্মসংযম।

মনে মনে অদ্ভুত ব্যাপারগুলো শুধু একবার ভেবে নিয়েছি। এ পর্যন্ত যা দেখলাম শুনলাম, সবই তো হিসেবের বাইরে।

ঘনাদা সাত-সকালে ছাদের ওপর পারচারি করছেন।

আমাদের ডাকে তিনি ফিরে দাঁড়িয়েছেন ও তখন তাঁর মুখের পেশীর কুঞ্চনে যে ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে প্রসন্ন হাসি বললে মানহানির দায়ে বোধ হয় পড়তে হয় না।

সবচেয়ে মোক্ষম কথা হল এই যে, ঘনাদা প্রত্যূষের পদচারণার সঙ্গে যুদ্ধের কথা ভাবছেন বলে নিজমুখে স্বীকার করেছেন।

এর পর আর আমাদের পায় কে!

নেহাত ওপরে আসবার ছুতো হিসেবে বিকেলের মেনুটা একটু আলোচনা করেই নিচে নেমে গেছি তৈরী হয়ে আসবার জন্যে।

যুদ্ধের কথা ভাবছেন ঘনাদা। সুতরাং জঙ্গী দপ্তরের সব বিভাগেই খবর চলে গিয়েছে তৎক্ষণাৎ! বনোয়ারী চলে গেছে গরম জিলেবীর দোকানে, রামভুজ কড়া চাপিয়েছে নিজেদের হেঁসেলেই কচৌরী ভাজবার জন্যে।

আর আমরা ঠিকমতো তোড়জোড় করে সদলবলে গিয়ে হাজির হয়েছি টঙের ঘরে। উপস্থিতিটা ঠিক সময়েই ঘটেছে। ছাদের পায়চারি শেষ করে ঘনাদা ঘরে এসে তাঁর নিজস্ব চৌকিতে বসে বসে গড়গড়ায় দু-একটি টান মাত্র দিয়েছেন।

যুদ্ধের কথা ভাবছিলেন ঘনাদা?—গৌর চৌকাঠে পা দিয়েই শুরু করেছে—যুদ্ধের সেরা কিন্তু মল্লযুদ্ধ, শুনলেই গা গরম হয়ে ওঠে।

গরম হয়ে ওঠার প্রমাণ হিসেবে গৌর আবৃত্তি শুরু করতেও দেরি করেনি—

মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয়॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীণ।

বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন ॥
তথাপি বিক্রমে ভীম হইতে নহে উন।
পদাঘাত দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ ॥
আঁচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে জড়াজড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জ্জর অঙ্গ পদাঘাতে নখে ॥

গৌর আরও খানিক আবৃত্তি চালিয়ে যেতে পারতো বোধ হয় কিন্তু ঘনাদার মুখের দিকে চেয়েই তাকে একটু দ্বিধাভরে থামতে হল।

তখন আমাদেরও বুকে একটু ধুকপুকুনি শুরু হয়েছে।

এই খানিক আগে যেখানে অমন অনুকূল বাতাস বইছিল, সেখানে হঠাৎ একটু গুমোটের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি?

ঘনাদা গড়গড়ার নলটা হাতে নিয়ে যেন টানতে ভুলে গেছেন। ভাতের গ্রাস মুখে দিতে দাঁতে যেন একটু বালি পেয়েছেন এমনি মুখের ভাব।

মনে মনে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

এমন সুদিনে কোন্‌খানে পান থেকে চুন খসল বুঝতে না পেরে শিশির তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরে বললে, তামাকটা বুঝি ঠিক জুতসই হয়নি আজ?

ঘনাদা শিশিরের এগিয়ে দেওয়া সিগারেটের দিকে দৃক্‌পাতও করলেন না। সেই ঈষৎ বালি-চেবানো মুখের ভাব নিয়ে কোন্ সুদূর ভাবনায় যেন মগ্ন হয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন,—না, ভুল।

ভুল! আমরা তো তাজ্জব! ভুলটা কোথায়? তামাক সাজায়?

নিজেদের বুদ্ধির দৌড় মাফিক ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তামাকটা আর একবার সাজিয়ে দেব ঘনাদা?

না, ভুল তামাক সাজায় নয়,—ঘনাদা গড়গড়ার নলে দু-তিনটে চটপট টান দিয়েই বুঝিয়ে বললেন,—ভুল ওই লড়াই-এর বর্ণনায়।

লড়াই-এর বর্ণনায় ভুল!—ক'দিন ধরে লাইনগুলো মুখস্থ করেছে

বলে গৌর বেশ ক্ষুণ্ণ—কিন্তু কাশীরাম দাসের খাঁটি সংস্করণ থেকে তুলে এনেছি।

তাছাড়া—আমিও এবার একটু মদৎ দিলাম গৌরকে—কালী সিংহীর আদি মহাভারতের অনুবাদেও তো ওই রকম আছে।

যা আছে তা ভুল।—যেন নিতান্ত আফসোসের সঙ্গে জানালেন ঘনাদা,—আসলটা পাওয়া যায়নি বলে অমনি করে গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে।

—আসলটা পায়নি ?

—মূল মহাভারতেও গোঁজামিল ?

—কীচক-ভীমের অমন জবর যুদ্ধটার বর্ণনাও বেঠিক ?

আমাদের চোখগুলো কপালে ওঠার সঙ্গে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাগুলো ভেতরে আর চাপা রাখা গেল না।

তার অমন আবৃত্তিটা মাঠে মারা যাওয়ার জন্যে গৌরের মেজাজটাই সবচেয়ে খারাপ। বেশ একটু ঝাঁঝালো গলাতেই সে জিজ্ঞাসা করলে,—আসলটা কী ছিল কী ?

কী ছিল ?—ঘনাটা একটু জীবে দয়া গোছের মুখের ভাব করে বললেন—ছিল সত্যিকার একটা নিযুদ্ধের বিবরণ।

নিযুদ্ধ! সে আবার কী ?

প্রশ্নটা আমাদের মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই ঘনাদা অবশ্য নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন—নিযুদ্ধ মানে বিনা অস্ত্রে লড়াই। তখনকার দিনের শাস্ত্রীয় মল্লযুদ্ধের ওই ছিল আরেক নাম। আর ভীমসেন কীচকের সঙ্গে শাস্ত্রমতেই লড়েছিলেন।

—শাস্ত্রমতে লড়েছেন ভীমসেন! তবে যে···?

ওই তবে যে···টুকুই ফাঁকি।—আমাদের বাধা দিয়ে বিবৃত করলেন ঘনাদা,—ভীমসেনের অন্য যা দোষই থাক রাজাগজার মানের জ্ঞান টনটনে। তাই সে মহলের আদব-কায়দা সম্বন্ধে খুবই হুঁশিয়ার। জংলী বলে ধরে হিড়িম্বের সঙ্গে যেভাবে যুদ্ধ করেছেন, কীচকের বেলা তা ভাবতেও পারেন না। যত বড় পাপিষ্ঠই হোক,

কীচক রাজাগজাদেরই তো একজন। বিরাট রাজার সম্বন্ধী, তার ওপর আবার মৎস্য দেশের সেনাপতি। তাই তাকে মোক্ষম শিক্ষা দিতে গিয়েও শাস্ত্রের বাইরে ভীমসেন যাননি।

শাস্ত্রমতে আসল নিযুদ্ধটা কি রকম হয়েছিল শুনি!—গৌরের গলায় বেশ ছুঁচোল সন্দেহ।

শুনবে? শোনো তাহলে!—ঘনাদা চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখার ধারাবিবরণী দিতে শুরু করলেন—শাস্ত্রমত নমস্কার আর হাত নেওয়ার পর কীচক করল কক্ষাস্ফোটন আর ভীমসেন স্কন্ধতাড়ন। এবার দুজনে কক্ষাবন্ধ হয়েছে। ওই কীচক ভীমসেনকে পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ করছে। ভীমসেন টলছে, টলছে, চোখে যেন সর্ষে ফুল দেখছে, পড়ে যাচ্ছে কাটা কলা গাছের মতো। ওই পড়ছে, পড়ছে, পড়ল,—না, না, পড়েনি। পড়তে পড়তে ভীমসেন সামলে বহিকন্টক লাগিয়েছে। গেল গেল, কীচক বুঝি জরাসন্ধ হয়ে গেল, চিড় খাচ্ছে, খাচ্ছে,—না, ভীমসেনের কৃত-এর পর কৃতমোচন করেছে কীচক, সুসঙ্কট দিয়ে সন্নিপাত করে অবধূত করেছে ভীমসেনকে···

—দোহাই! দোহাই ঘনাদা! একটু থামুন!

সবাই মিলে আর্তনাদ করেই ঘনাদাকে থামাতে হল। 'কক্ষা-স্ফোটন' 'স্কন্ধতাড়ন' থেকে 'কক্ষাবন্ধ', 'পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ' পর্যন্ত কোনো-রকমে সহ্য করা গেছল, কিন্তু 'বাহুকন্টক' থেকে 'কৃত', 'কৃতমোচন' হয়ে 'সুসঙ্কট', 'সন্নিপাত' ছাড়িয়ে 'অবধূত'-এ পৌঁছোবার পর আমাদেরই অবস্থা কাহিল। চরকিপাক লাগা মাথায় তাই প্রায় খাবি খাওয়া গলায় বলতে হল,—বনোয়ারীকে দিয়ে ক'টা অ্যাসপিরিন আগে আনিয়ে নিই।

ওঃ—ঘনাদা অনুকম্পায় কোমল হলেন,—মাথায় কিছু ঢুকছে না বুঝি! আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এসব হল সেকালের আখড়াই বুলি। বিরাটপুরীর জিমূত পালোয়ানের আখড়া ছিল সবচেয়ে নামকরা। নিযুদ্ধের বুলি সেখান থেকেই বেশীর ভাগ আমদানী। 'কক্ষাস্ফোটন' আর 'স্কন্ধতাড়ন' হল লড়াইয়ের আগে মল্লদের হাতপা নেড়ে যাকে

বলে গা-গরম করা–'কক্ষাবন্ধ' হল লড়াইয়ের প্রথম জাপটাজাপটি মানে আলিঙ্গন। 'পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ' হল দুহাতের আঙুল শক্ত করে শত্রুর মাথায় চাঁটি! এক পা চেপে ধরে আরেক পা টেনে ছেঁড়ার নাম 'বাহুকণ্টক।' শত্রুকে মারের প্যাঁচ হল 'কৃত', আর সে প্যাঁচ ছাড়ানো মানে কৃতমোচন হল 'প্রতিকৃত'। শক্ত ঘুষি-পাকানো হল 'সুসঙ্কট', আর তার কাজ হল 'সন্নিপাত'। 'অবধূত' হল শত্রুকে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

ঘনাদার এ ব্যাখ্যায় মাথা ঘোরা বন্ধ না হলেও ভীমসেনকে 'অবধূত' করার খবরে বেশ একটু বিমূঢ় হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হল–স্বয়ং ভীমসেনকে 'অবধূত' মানে দূরে ছুঁড়ে ফেললে কীচক?

তা তো ফেললেই।–ঘনাদা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে যেন বাধ্য হলেন–শুধু কি অবধূত? মাটিতে ফেলে তারপর যা 'প্রমাথ' মানে দলাইমলাই দিতে লাগল তাতে মনে হল, ভীমসেনের হাড়গোড়ই বুঝি গুঁড়ো হয়ে যায়। 'প্রমাথ'তেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভীমসেনকে তুলে ধরে 'উন্মথন' মানে পেষাই দিতে লাগল কীচক।

ঘনাদা এমন একটা মহাসঙ্কটের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যেই একটু থামলেন। তারপর ত্রিকালদর্শী 'টেলিফটো লেন্স'টা যেন ঠিক 'ফোকাস' করে নিয়ে চাক্ষুষ ধারাবিবরণীতে মেতে উঠলেন আবার—এখনো উন্মথিত করছে কীচক। কী হল গো ভীমসেনের? সাড় নেই নাকি শরীরে? কীচক তো এবার প্রাণের সুখে 'প্রসৃষ্ট' মানে আলগা হাতের চাপড় লাগাচ্ছে। এরপর তো 'বরাহোদ্ধতনিঃস্বন' মানে কাঁধে তুলে মাথা নীচে ঝুলিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে দূরে আছড়ে মারবে। তাহলেই তো খেল খতম!

নাচঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী ভয়ে কাঁপছেন। কাঁপছেন অলক্ষ্যে বিনা টিকিটে যাঁরা লড়াই দেখতে এসেছেন সেই ছোট-বড় দেবতারা। ভীমসেনের রুস্তম-ই-হিন্দ থুড়ি ভারত-মাতঙ্গ খেতাব বুঝি যায়, ভীমসেন বুঝি মহাভারত ডোবায়! ন-ন্-ন্-ন্—না—। ওই তো 'শলাকা' মানে, সোজা লোহার মতো শক্ত এক

আঙুলের খোঁচা লাগিয়েছে ভীমসেন। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ভীমসেনকে কাঁধ থেকে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছে কীচক। মাটিতে পড়েই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে ভীমসেন। ভীমসেন না, মত্ত মাতঙ্গ। কীচকের চারিধারে 'অভ্যাকর্ষ' অর্থাৎ বাগে পাবার মৌকা পেতে পাক দিয়ে ফিরছে ভীমসেন। এই আচমকা 'অবঘট্টন' মানে হাঁটু আর মাথার গুঁতো কীচকের বুকে আর পেটে। তারপর আকর্ষণ, মাটিতে ফেলে বিকর্ষণ, কোলে তুলে হাত-পা দুমড়ে প্রকর্ষণ আর সর্বশেষে প্রাণ-হরণ।

ঘনাদা থামলেন। আমরা অভিভূত স্বরে বললাম, এই তাহলে কীচক-বধের আসল বৃত্তান্ত! কিন্তু এতে তো ভীমসেনের লজ্জার কিছু নেই। যা আছে বরং যুদ্ধ হিসেবে গৌরবের। সুতরাং এসব কথা মহাভারত থেকে লোপাট করার দরকারটা কী ছিল?

কিছুই ছিল না। ঘনাদা যেন মুখখানা তেতো করে বললেন,—ওই দুটো বোকা ফালতু ভাইয়ের দোষেই এই হিতে বিপরীত।

বোকা ফালতু ভাইদুটো মানে নকুল-সহদেব বুঝলাম। কিন্তু তাদের বুদ্ধির দোষটা কী, আর তাতে হিতে বিপরীতটা কিরকম?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম ঘনাদাকে।

কিরকম তা বলতেও মেজাজ খিচড়ে যায়! ঘনাদা যেন আমাদের কাছেই সাড়ে তিনহাজার বছরের জমানো গা-জ্বালাটা প্রকাশ করলেন—দুই হাঁদা ভাইয়ের মাথায় হঠাৎ বাই চাপল আদি পর্ব থেকে জতুগৃহদাহ অধ্যায়টা একটু ছাঁটাই করতে হবে। মানে কুন্তী মায়ের নামে কোন নিন্দে যেন কখনো না উঠতে পারে।

কুন্তী মায়ের নামে নিন্দে উঠবে কেন?—আমরা অবাক,—জতুগৃহ পোড়াবার প্ল্যান তো দুর্যোধনের হুকুমে পুরোচনের!

তা ঠিক।—ঘনাদা আমাদের জ্ঞান দিলেন—কিন্তু আসলে ও মোম-গালার ঘরে আগুন দিয়েছিল তো ভীমসেন, আর ছেলেদের সঙ্গে লুকিয়ে কাটা সুড়ঙ্গ দিয়ে পালাবার আগে কুন্তী দেবীর একটা দারুণ অন্যায় হয়েছিল।

কুন্তী দেবীর আবার কী অন্যায় ? —আমরা বিমূঢ়।

অন্যায় পালাবার আগে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নামে ভুরিভোজের ব্যবস্থা।—ঘনাদা কুন্তী দেবীর সমালোচনায়, না সেই সুদূর ভুরি-ভোজের গন্ধে নাক কুঁচকোলেন, ঠিক বোঝা গেল না—যে এসেছে তাকেই গাণ্ডেপিণ্ডে খাইয়ে একেবারে অচল করে দিয়েছেন। সেই নিষাদ মা আর তার পাঁচ ছেলে ওই ফাঁসির খাওয়া খেয়েই না পেট চাক হয়ে অমন বেহুঁশ হয়েছিল! নিজেরা পালাবার সময় ওই মা-ছেলেদের জাগিয়ে দিয়ে সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল না কুন্তী দেবীর? এসব কথা কেউ যাতে আর না তুলতে পারে, নকুল-সহদেব তাই কুন্তী দেবীর ভোজ দেবার ব্যাপারটাই বাদ দিতে চেয়েছিল মহাভারত থেকে।

কিন্তু সে সব কথা তো মহাভারতে জ্বলজ্বল করছে এখনো।—আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—ও দুই হাঁদা ভাই আসল জায়গায় মানে দারুক-মূষিক এজেন্সীতে যায়নি বুঝি? সেখানে গেলে তো গণেশের বাহন-বাহাদুর কবে বেমালুম সব কেটে উড়িয়ে দিত।

হাঁদা হোক, ফালতু হোক, যমজ দুভাই সে কথা কি আর জানত না!—ঘনাদা নকুল-সহদেবের হয়ে একটু বললেন—ভীমদাদা আর পুরুত মশাই ধৌম্য ঠাকুরের কাছে একটু আঁচ পেয়েই তো তারা মতলবটা ভেঁজেছিল। কিন্তু তারা যখন খোঁজ করতে গেছে, তখন ইন্দ্রপ্রস্থের চোরাগলিতে সব ভোঁ ভাঁ। দারুক-মূষিক কোম্পানী লালবাতি জ্বেলে গণেশ উল্টে পালিয়েছে।

দারুক-মূষিক এজেন্সী ফেল!—আমরা যেমন বিস্মিত তেমনি একটু হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

কেন আর!—ঘনাদা গোপন তথ্যটা জানালেন,—গণেশঠাকুরের বাহনটি ঘুষ খেয়ে খেয়ে শুয়োরের মতো এইসা মোটকা তখন হয়েছে যে, পুঁথিঘরের গর্ত দিয়ে গলতেই পারে না। ওদিকে শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক বাবাজির পেছনেও তখন খাজাঞ্চী দপ্তরের চর লেগেছে। সব দিক দিয়ে বেগতিক বুঝে দ্বারকাতে গিয়ে ডুব মেরেছেন তাই।

দারুক-মূষিকের খোঁজ না পেয়ে দুই হাঁদা ভাই যখন দিশেহারা, তখন একদিন দুপুরে শোনে তাঁদের রাজড়াপাড়ার রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে,—'কান কটকট, দাঁতের দরদ, ছাতা-জুতো সারাই, উই লাগাই উই ধ—রা—ই।'

ছাতা-জুতো-জামা-কাপড় সারানোর কথা তো জানা, দাঁতের-কানের ব্যথা সারানোও নতুন নয়। কিন্তু উই লাগানো, উই ধরানো আবার কী!

'ডাক! ডাক তো ওকে।'—দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ফেরিওয়ালার সঙ্গে আলাপ করে দুই ভাইয়ের আহ্লাদ আর ধরে না। মোক্ষম যা একটি প্যাঁচ এবার পাওয়া গেছে, তার কাছে দারুক-মূষিক কোম্পানীর কসরৎ কোথায় লাগে!

ফেরিওয়ালার কাঁধে ঝোলানো বিজ্ঞাপনে তার খেতাব লেখা আছে, বল্মী-বিশারদ। গালভরা নামটার আসল মানে হল উই পোকার ওস্তাদ। ফেরিওয়ালা উই পোকা পোষে। সেই পোষা উই দিয়ে পুঁথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ সব সে যেমনটি চাই তেমনি সংশোধন করে দিতে পারে।

তাকে টেকাবার ক্ষমতাও কারুর নেই। দারুকের শুয়োর মার্কা মূষিক তো ছার, সবচেয়ে পুঁচকে নেংটি ইঁদুরের ল্যাজও যেখানে ঢোকে না চুলের মতো মিহি তেমন একটা ফুটো পেলেই তার কাম ফতে। তার পোষা উইয়েদের অসাধ্য কিছু নেই। হুকুম পেলে তারা রাজধানীর মহাফেজখানাই এক রাত্রে সাফ করে দিতে পারে!

মহাফেজখানা নয়, সামান্য ক'টা ছত্র। আনন্দে গদগদ হয়ে নকুল-সহদেব বারণাবতের জতুগৃহদাহের কোন্ জায়গাটা লোপাট করতে হবে বুঝিয়ে মোটা বায়না দেয় বল্মী-বিশারদকে।

তাইতেই সর্বনাশ হয়।

পোষা উই-বাহিনী কাজ করে দেয় ঠিকই, কিন্তু একচুল দিক ভুলের দরুন বারণাবতের জতুগৃহের বদলে বিরাট পর্বের ভীম-কীচক যুদ্ধটাই দেয় চিরকালের মতো কেটে লোপাট করে।

চিত্রার্পিত কথাটা সবাই নিশ্চয়ই জানে।

আমি জানতাম না।

অন্তত অমন চাক্ষুষভাবে মানেটা বোঝবার সুযোগ কখনো পাইনি।

সেদিন পেলাম।

সেদিন মানে, শুভ ২৪শে আষাঢ় * খ্রীষ্টাব্দ ৯ই জুলাই অ ২৪

আহাব মুং ১৫ জম-য়ল, প্রতিপদ দং ২৫।৩৬।০ ষ ৩।১৪।৪৯ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র দং ৪৮।৩০।৫৬ রাত্রি ঘ ১২।২৪।৪৭ ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারিখটা তো বুঝলাম কিন্তু সালটা কি কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে বলব পাঁজি দেখে নিন।

আর মানে জানতে চাইলে অকপটে সত্য কথাটা স্বীকার করব।

মানে আমি কিছুই জানি না এবং বুঝিনি।

শুধ্ দিনটা পার হয়ে যাবার পর তার আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার কারণ কিছু কোথাও পাওয়া যায় কি না খোঁজার চেষ্টায় পাঁজি খুলে ওই সব বুকনি পেয়ে মাথাটা আরো গুলিয়ে গিয়েছিল।

দিনটা সত্যিই অদ্ভুত।

অমন যে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের দোতলার আড্ডা-ঘর সেখানেও অমন কাণ্ড বুঝি কখনো হয়নি।

সে কাণ্ড বর্ণনা করতে গেলে প্রথমে ওই চিত্রার্পিত দিয়েই স্থুরু করতে হয়।

হ্যাঁ আমরা সবাই চিত্রার্পিত।

আমরা মানে আমি শিবু শিশির গৌর তো বটেই, তাঁর মৌরসী আরামকেদারায় স্বয়ং ঘনাদাও তাই।

সবাই মিলে যেন নড়ন চড়ন হীন একটা আঁকা ছবি।

ছবিটা আবার সহজ স্বাভাবিক নয়। যেন একটা সচিত্র রহস্য-গল্পের পাতা খুলে বার করা।

রহস্যটাও যে সাধারণ নয় তা ঘনাদা আর আমাদের সকলের চোখ মুখের ভাব থেকেই বোঝবার। আমরা সবাই যেন ভূত দেখেছি।

ঘনাদার চেহারাটাই সবচেয়ে দেখবার মতো। চোখগুলো যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার যোগাড়। আর মুখটা একেবারে হাঁ।

তা চোখ মুখের আর অপরাধ কি?

ব্যাপার যা ঘটেছে তাতে আর কেউ হলে খানিকটা বেহুঁশ হলেও বলার কিছু থাকত না। ঘনাদা বলেই তাই শুধু চোখদুটো

জানাবড়ায় বেশী আর কিছু করেননি।

ধানাই পানাই একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে মনে করে যদি কেউ ধৈর্য হারিয়ে থাকেন তাহলে ব্যাখ্যাটা আর চেপে রাখা নিরাপদ হবে না। সবিস্তারে খুলেই বলা যাক ঘটনাটা।

শুক্রবারের সন্ধ্যা, নিচের হেঁশেলে রামভুজ রাতের জন্যে স্পেশাল মেনুর আয়োজনে ব্যস্ত। বনোয়ারীকে যখন দেখা যাচ্ছে না তখন সেও সেই বড় ধান্দায় নিশ্চয় কোথাও প্রেরিত হয়েছে ধরে নিতে হবে।

সন্ধের আসর ইতিমধ্যে জমে ওঠবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। রাত্রের স্পেশাল মেনু আগাগোড়া ঘনাদার নির্দেশ মাফিকই তৈরী হয়েছে। ঘনাদা তাই প্রসন্ন মনে একটু আগে আগেই আমাদের আড্ডাঘরে এসে তাঁর মৌরসী কেদারা দখল করেছেন। আমরাও হাজিরা দিতে দেরী করিনি।

আসল নাটকের যবনিকা উঠবার আগে যেমন সামান্য একটু অরকেস্ট্রা-বাদন, তেমনি রাতের ভুরিভোজের ভূমিকা হিসাবে কিছু টুকিটাকির ব্যবস্থা হয়েছে।

বনোয়ারী অনুপস্থিত। তাই আমরা নিজেরাই পরিবেশনের ভার নিয়েছি। কাঁথামুড়ি টি-পটের সঙ্গে পেয়ালা টেয়ালা ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম সমেত ট্রেটা শিশির নিজেই নিয়ে এসেছে বয়ে। ট্রের ওপর এখনো-না-খোলা চোখজুড়োনো সিগারেটের টিনটা সাজিয়ে আনতেও ভোলেনি।

শিশির তার ট্রেটা একটা টিপয়ে রাখতে না রাখতে আমি আরেকটা ট্রে নিয়ে এসে হাজির হয়েছি। সিগারেটের টিনটা না আমার ট্রের প্লেটগুলোর দিকে চোখ দেবেন ঠিক করতে না পেরে ঘনাদার তখন প্রায় ট্যারা হবার অবস্থা।

আমি আমার ট্রে থেকে জোড়া ফিশরোলের প্লেটটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে সে সঙ্কট কিছুটা মোচন করেছি।

তারপর আমরা নিজেরাও এক একটা প্লেট নিয়ে যথাস্থানে বসবার পর বরটর দেবার আগে দেবতাদের মতো একটা প্রসন্ন হাসি

মুখে মাখিয়ে ঘনাদা তাঁর প্লেট থেকে একটি ফিশরোল সবে তুলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে—

এমন সময়ে সেই তাজ্জব কাণ্ড!

হঠাৎ যেন বাইরের বারান্দায় শুনলাম,—অয়মহম ভোঃ!

তারপরের মুহূর্তেই 'তিষ্ঠ' শুনে মুখ ফেরাবার আগেই ঘনাদার দিকে চেয়ে চক্ষু স্থির।

ঘনাদার প্লেটের ফিশরোল তাঁর হাতে নেই, মুখে নেই, তাঁর ঠিক নাকের ওপরে ঝুলছে।

এমন ব্যাপারে একেবারে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে যা হলাম তাকে চিত্রার্পিত বলে বর্ণনা করা খুব ভুল হয় কি!

এ ঝুলন্ত ফিশরোলের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আসর-ঘরের মধ্যে এক নাটকীয় প্রবেশে আমাদের চটকা ভাঙল।

ঘরের মধ্যে যিনি তখন এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে বর্ণনা করব কেমন করে সেইটাই ভেবে পাচ্ছি না।

জটাজুটধারী বলে শুরু করে ওইখানেই থামতে হয়। তারপর সন্ন্যাসী আর বলা চলে না। কারণ মাথায় বোটানিক্‌সের বটের ঝুরির মতো জটা আর মুখে একমুখ গোঁফ দাড়ির কঙ্গো থুড়ি 'জা-ঈর'-এর জঙ্গল থাকলেও তারপর কৌপীন বাঘছাল কমণ্ডলু চিমটে টিমটে কিছু নেই। নেহাৎ সাধারণ পাঞ্জাবী পাজামা। তবে ছোপটা একটু অবশ্য গেরুয়া।

এ হেন মূর্তি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে যেন ঘনাদাকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করে বজ্রস্বরে ভর্ৎসনা করলেন—লজ্জা করে না তোমাদের! অতিথি যখন দ্বারে সমাগত তখন তার পরিচর্যার ব্যবস্থা না করে নিজেদের ভোজনবিলাসে মত্ত হয়েছ?

কথাগুলোয় সংস্কৃতের ঝংকার থাকলেও এবার ভাষাটা মোটামুটি বাংলা।

কিন্তু বাংলা বা সংস্কৃত যাই হোক ওই ভর্ৎসনায় আমাদের অবস্থাটা খুব সুবিধের হবার তো কথা নয়।

ঘনাদার দিকে একবার চেয়ে তাঁর অবস্থাটাও বুঝে নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আর ফুরসৎ মিলল না।

আধা-সন্ন্যাসী আগন্তুকের বজ্রস্বর আবার শোনা গেল আর সেই সঙ্গে আরেক ভোজবাজি!

যে লোভে অতিথির অমর্যাদা করেছ, দুর্বাসার আধুনিক সংস্করণ তখন গর্জন করেছেন, – সেই লোভের গ্রাসেই তাহলে ছাই পড়ুক!

এই অভিশাপ বাণী মুখ থেকে খসতে না খসতে ঘনাদার নাকের সামনে ঝুলন্ত ফিশ-রোল যেন লাফ দিয়ে ছাতে গিয়ে ঠেকে ছত্রাকার হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আমরা তখন হাঁ হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছি।

আমাদের শোক তখন ছাদে ঠেকে ছত্রাকার ফিশরোলের জন্যে নয়। আমাদের সব উদ্বেগ ঘনাদার মুখের দিকে চেয়ে।

ব্যাপারটা কেমন মাত্রাছাড়া হয়ে গেল কি?

কি করবেন এবার ঘনাদা?

এস্পার ওস্পার একটা কিছু করে ফেলবেন না কি? আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠেই চলে যাবেন না কি গটগটিয়ে তাঁর টঙের ঘরে? না, দুর্বাসার নতুন এডিশনকে পাল্টা গর্জন শুনিয়ে ছাড়বেন।

ভুল, সব অনুমান আমাদের ভুল।

ঘনাদাকে অত সহজে যদি চেনা যেত তাহলে আমরা এমন কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর কাছে নাড়া বেঁধে থাকি!

দ্বিতীয় দুর্বাসার প্রতি গর্জন বা নিজের টঙের ঘরে সটান প্রস্থান, কিছুই করলেন না ঘনাদা।

তার বদলে আমাদের সকলকে একেবারে থ' করে নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে উঠে ঘনাদার সে কি বিনয়ের ভঙ্গি!

—নন্নুক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ। অবহিতোঽস্মি!

কিন্তু এসব আবোল তাবোল বলছেন কি ঘনাদা! হঠাৎ নাকের ডগা থেকে 'ফিশ্‌রোল' উধাও হয়ে গেছে বলে মাথাটাই বিগড়ে গেল নাকি!

আমরা যখন ভ্যাবাচাকা মেরে দাঁড়িয়ে, ঘনাদা তারই মধ্যে নিজের কেদারাই ঠেলে দিয়েছেন দু নম্বর দুর্বাসার দিকে।

দুর্বাসা ঠাকুরও কি একটু দিশাহারা!

তাঁর দাড়ি গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। তবে ঘনাদার বিনয়েই বোধহয় রাগটা তখন তাঁর প্রায় জল হয়ে গেছে মনে হল। ঘনাদার এগিয়ে দেওয়া কেদারাটা না নিয়ে তিনি নিজেই কোণ থেকে আরেকটা চেয়ার টেনে বসে একটু প্রসন্ন কণ্ঠেই বললেন—যাক্ আমি প্রীত হয়েছি তোমার বিনয়ে আর দেবভাষার প্রয়োগে! আমার ক্রোধ আ৷ম সংবরণ করলাম।

আমাদের ভাগ্য ভালো যে যত খটমটই হোক দ্বিতীয় দুর্বাসার কথাটা এবার বাংলা বলেই বুঝলাম। কিন্তু দেবভাষার কথা কি বললেন উনি।

দেবভাষা মানে তো সংস্কৃত। আবোল তাবোল নয়, ঘনাদা তাহলে সংস্কৃতই বলেছেন জবাবে!

এবার দুর্বাসা দি সেকেণ্ডের সঙ্গে আলাপে তিনি যদি সেই সংস্কৃত চালান তাহলেই তো গেছি!

না। সে বিপদটা কলির দুর্বাসার একটা চালের দরুনই কাটল বলা যায়। দুর্বাসা ঠাকুর শুধু ক্রোধ সংবরণ করেই তখন ক্ষান্ত হলেন না, সেই সঙ্গে ক্ষমায় উদার হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমাদের মধ্যে ঘনশ্যাম কার নাম?

প্রশ্নটা শুনেই চমকে উঠেছিলাম। যত উদার ভাবেই করা হোক চালটা নেহাৎ কাঁচা হয়ে গেল না? বাহাত্তর নম্বরে ঢুকে ঘনশ্যাম কার নাম ঘনাদাকেই জিজ্ঞাসা করা!

এই এক বেয়াড়া প্রশ্নেই অন্য দিন হলে তো সব বানচাল হয়ে যেত। আজ কিন্তু যাকে বলে অঘটন ঘটার দিন। শুধু ফিশরোল-এর বেলা নয় সব কিছুতেই ভোজবাজি হয়ে যাচ্ছে! কাঁচা চালেই কাজ হয়ে গেল।

অমন একটা প্রশ্নেও ঘনাদা ফাটলেন না, বরং বিনয়ে গলে গিয়ে

সংস্কৃত থেকে সরল না হোক, কাঁকর বালি সমেত অনন্ত বোধগম্য বাংলায় নেমে এলেন।

আজ্ঞে অধীনের নামই ঘনশ্যাম! ঘনাদার মুখে লজ্জিত স্বীকৃতি শুনে আমরাই তাজ্জব,—আপনার প্রতি অমনোযোগের অপরাধে মার্জনা ভিক্ষা করছি। সত্যিই আপনাকে প্রথমে চিনতে পারিনি।

প্রথমে চিনতে পারোনি!—দুর্বাসা ঠাকুরের গলা যেন একটু কাঁপা,—এখন পেরেছ নাকি?

না।—কুণ্ঠিতভাবে জানালেন ঘনাদা,—তবে গোড়ায় আপনাকে সেই মালাঞ্জা এম্পালে বলে ভুল করেছিলাম।

মা-লা-ঞ্জা এম্-পা-লে! দুর্বাসা মুনির গলার স্বরটা এবার দাড়ি গোঁফের জঙ্গলেই যেন প্রায় চাপা পড়ে গেল,—আমাকে ওই, ওই, তাই ভেবেছিলে!

আজ্ঞে হ্যাঁ,—ঘনাদা নিজের ভুলের জন্যে যেন অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে বললেন,—সেই যে সাংকুরু নদীর ধারে এমবুজি মাঈ থেকে চোরাই হীরে পাচার করার জন্যে আমায় ম্যাজিকের ধোঁকা দিয়ে এপুলুতে নিয়ে গিয়ে মিথ্যে খবরে ইতুরির গহন বনে পাঠিয়ে জংলীদের ঝোলানো ফাঁদে ফাঁসিতে লটকে মারবার চেষ্টা করেছিল, আর যার মতলব হাসিল হলে পৃথিবী আরো বিরাট হয়ে দুনিয়ার কি দশা হত জানি না, সেই মালাঞ্জা এম্পালে ভেবেই আপনাকে একটু তাচ্ছিল্য করেছিলাম গোড়ায়। তবে—অত্যন্ত বিশ্রী কষ্টকর স্মৃতি মনে না আনবার জন্যেই ঘনাদা যেন চেপে গিয়ে দুঃখের নিশ্বাস ফেলে বললেন,—থাক সে কথা!

থাকবে মানে!—আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। বলেন কি ঘনাদা! চোরাই হীরে ম্যাজিকে পাচার করার ব্যাপারে ইতুরি না ফিতুরির জঙ্গলে ঘনাদা ঝোলানো ফাঁস থেকে ফাঁসি যেতে যেতে বাঁচলেন, আর দুনিয়া তাতে আরো বিরাট হতে না পেরে কি দশা থেকে বাঁচল কেউ জানে না,—এতদূর শুনে আমরা ঘনাদাকে 'থাক্' বলে থামতে দেব! কিন্তু আমাদের মুখ খুলতে হল না।

না না থাকবে কেন?—আমাদের আগে দুর্বাসাই নাছোড়বান্দা হলেন,—মনে যখন হয়েছে তখন বলেই ফেলো। বদখদ্ কিছু হলে সে স্মৃতি পেটে রাখতে নেই, বুঝেছ কি না? তাতে আবার বদহজম হয়।

না, বদহজম আর কি হবে! ঘনাদা একটু যেন হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—পেটেই যখন কিছু পড়েনি।

তাও তো বটে। তাও তো বটে!—দুর্বাসা ঠাকুরই এবার বেশ ব্যতিব্যস্ত,—আমি আবার অভিশাপটা ভুল করে দিয়ে ফেলে খাওয়াটাই নষ্ট করে দিয়েছি। তা তোমরা···

দুর্বাসা আমাদের দিকে ফিরলেন। ফেরায় অবশ্য দরকার ছিল না। ঘনাদার মুখের খেদটুকু শেষ হতে না হতে শিশির শিবু দুজনেই ছুটে নেমে গেছে নিচে।

দুর্বাসা যখন মুখ ফেরালেন তখন দুজনেই ফিরে দরজা পেরিয়ে ঘরের ভেতরে এসে হাজির দুটি প্রমাণ সাইজের প্লেট হাতে নিয়ে।

তার একটা ঘনাদার আর অন্যটি দুর্বাসার হাতে দিতে দুর্বাসাই অত্যন্ত বিব্রত। আমি মানে—আমি—প্লেটটার জোড়া ফিশরোলের দিকে চেয়ে তাঁর যেন করুণ আর্তনাদ,—আমি তো কি বলে··

তা দুর্বাসার আর্তনাদ নেহাৎই অকারণ নয়। মাথার জটা ছাড়া দাড়ি গোঁফের যা জঙ্গল তিনি মুখে গজিয়েছেন তার ভেতর দিয়ে কিছু চালান করাই তো সমস্যা।

ঘনাদা নিজের প্লেটটির প্রতি যথাবিহিত মনোযোগ দিতে দিতেই আমাদের সেজন্যে ভর্ৎসনা করলেন—কি তোমাদের আক্কেল! ওঁকে এই সব খাবার দিয়ে অপমান করছ!

অপমান!—আমরা সত্যিই সন্ত্রস্ত,—অপমান কি করলাম?

অপমান নয়?—ঘনাদা বেশ ধীরে সুস্থে তাঁর ফিশরোল দুটির সদ্গতি করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন—ওঁকে কিছু খেতে বলাই তো অপমান। তোমার আমার মতো গাণ্ডে পিণ্ডে খেলে ওঁর এমন যোগ-শক্তি হয়, না ওই জটাজুটের ভার উনি বইতে

পারেন! যিনি স্রেফ হাওয়ার সঙ্গে হয়ত দু ফোঁটার বেশী জল মেশান না, তাঁকে দিয়েছ কিনা ফিশরোল! ছি ছি তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

আমাদের লজ্জা থেকে বাঁচাতে ঘনাদা এখন চায়ের পেয়ালা রেখে দুর্বাসা দি সেকেণ্ডের কাছেই গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে ফিশরোলের প্লেটটা দুর্বাসার কোল থেকে সরিয়ে নিজের আসনে এসে বসতে বসতে বললেন,—চোখের ওপর জিনিসটা নষ্ট হতে দিতে খারাপ লাগে তাই, নইলে ওঁর সামনে কিছু মুখে দিতেই সঙ্কোচ হয়।

ঘনাদার ডান হাতের কাজ তখন আবার শুরু হয়ে গেছে। তা দেখে আমরা যদি অবাক হওয়ার সঙ্গে একটু মজা পেয়ে থাকি আমাদের দুর্বাসা ঠাকুরের চেহারাটা যেন হতভম্ব হওয়ার চেয়ে বেশী কিছু মনে হল। দাড়ি গোঁফের অরণ্যের ভেতর দিয়ে তাঁর দু'চোখের দৃষ্টির প্রায় জ্বলন্ত ভাবটাও খেতে দেওয়ার অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে ঘনাদার প্রতি কৃতজ্ঞতা কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

ঘনাদা ইতিমধ্যে অবশ্য আমাদের সকলের হয়ে তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা সেরে ফেলে পেয়ালায় নতুন করে চা ঢেলেছেন। শিশিরও তার যথাকর্তব্য ভোলেনি।

শিশিরের এগিয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া সে সিগারেট থেকে বার-করা ধোঁয়ার বহর দেখে একটু ভরসা পেয়ে কেমন করে আবার আসল কথাটা তুলব ভাবছি, এমন সময় ঘনাদা নিজে থেকেই সদয় হলেন।

আমাদের যোগিবর দুর্বাসার কাছ থেকেই যেন অনুমতি চেয়ে বললেন,—পেটের কথা চেপে রাখতে নেই বলছিলেন না! আপনার উপদেশই মানতে চাই। শুধু ভাবছি এ সব বিশ্রী কথা আপনার সামনে বলা কি ঠিক হবে?

খুব হবে! খুব হবে!—দুর্বাসার হয়ে আবরা এবার সমস্বরে উৎসাহ দিলাম।

আমাদের উৎসাহটুকুর জন্যেই ঘনাদা যেন অপেক্ষা করছিলেন।

এর পর আর তাঁকে উস্কে দেবার দরকার হল না। নিজের স্টীমেই বলে চললেন, – আসল কথা কি জানো? ওঁকে মালাঞ্জা এম্‌পালে ভাবার জন্যেই এমন লজ্জা হচ্ছে। কোথায় উনি আর কোথায় সেই শয়তানের শিরোমণি। চেহারায় মিল আছে ঠিকই। মালাঞ্জা অবশ্য আরো ফর্সা ছিল, আরো মোটাসোটা জোয়ান চেহারার। তবে ওঁকে দেখে ভেবেছিলাম নিজের শয়তানির সাজাতেই বুঝি মালাঞ্জা এমন শুঁটকো মর্কট মার্কা হয়ে গেছে।

ঘনাদা গলা খাঁকরি দেবার জন্যে একটু থামলেন। আমাদের তখন যোগিবর দুর্বাসার দিকে একবার তাকাবারও সাহস নেই।

মালাঞ্জার ম্যাজিকও ছিল উঁচু দরের,—ঘনাদা আবার সুরু করে আমাদের যেন বাঁচালেন,—প্রথম ম্যাজিক দেখিয়েই সে আমায় মোহিত করে। একটা মানুষের খোঁজে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে তখন এমবুজি মাঈ শহরে এসে ক'দিনের জন্যে আছি। এমবুজি মাঈ শহর হিসেবে এমন কিছুই নয়, কিন্তু সেখান থেকে মাসে দুবার নিতান্ত ছোট দু এঞ্জিনের এমন একটা প্লেন ছাড়ে যা হুমকি দিয়ে একবার হাইজ্যাক্ করতে পারলে মঙ্গলগ্রহে না হোক চাঁদে অমন পাঁচটা রকেট নামানোর খরচ উঠে যায়।

এমবুজি মাঈ-এর কথা আপনি তো সবই জানেন!—ঘনাদা দুর্বাসাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হঠাৎ।

আমি···মানে···আমি—দুর্বাসার অবস্থা যেন একটু কাহিল বলে মনে হল।

আপনার তো সশরীরে যাবারও দরকার নেই। ঘনাদা ভক্তিভরে বললেন,—যোগবলেই সব জানতে পারেন। তার সময় পাননি বুঝি? আমিই তাহলে বলে দিই, এমবুজি মাঈ আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তরে এক রাজ্যের এমন এক শহর যার চারিধারের মাটি আঁচড়ালেও হীরে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সখ করে পরবার দামী হীরের অন্য অনেক বড় খনি আছে, কিন্তু যা দিয়ে সত্যিকার কাজ হয় শিল্পের দিক দিয়ে সে রকম দামী হীরের অদ্বিতীয় আকর হল

ওই এমবুজি মাঈ শহরের চারিদিকে কাসাই প্রদেশের লাল মাটি।

সেখানে একটি মাত্র সরকারী কোম্পানী মিবা-ই হীরে তোলবার অধিকারী। তারা প্রতিদিন যে পরিমাণ হীরে তোলে তার দাম কম পক্ষে দশ লক্ষ টাকা।

এ এমবুজি মাঈ শহর আর কাসাই প্রদেশ হল 'জানতি পারো না'র জ-দেওয়া জাঈর রাজ্যের অংশ। এ জাঈর রাজ্যের আগের নাম ছিল কঙ্গো। ১৯৬০ সালে এ রাজ্য স্বাধীন হবার পর নাম বদলে জাঈর রাখা হয়।

হীরের খোঁজে এমবুজি মাঈ শহরে আসিনি। এসেছি এমন একজনের খোঁজে দুনিয়ার সব হীরের চেয়ে যার দাম তখন আমার কাছে বেশী।

তার খোঁজ সুরু করেছিলাম উত্তর আমেরিকায় পৃথিবীর এক গভীরতম গিরিখাতে।

তার মানে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে!—গৌর বিদ্যে জাহির করবার সুযোগটা ছাড়তে পারলে না।

না।—কানমলাও খেল তৎক্ষণাৎ।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন-এর চেয়ে অন্তত আড়াই হাজার ফুট বেশী গভীর গিরিখাত ওই আমেরিকাতেই আছে,—ঘনাদা অনুকম্পাভরে জ্ঞান দিলেন,—আইডাহো আর ওরিগন স্টেট যা প্রায় দুশো মাইল ধরে ভাগ করে রেখেছে সেই স্নেক নদী-ই কমপক্ষে বিশ লক্ষ বছর ধরে পাহাড় কেটে এই গিরিখাত তৈরী করেছে। নাম তার হেল্‌স্ ক্যানিয়ন।

নামে হেল্‌স্ ক্যানিয়ন, অর্থাৎ নরকের নালা, কাজেও তাই। তা দিয়ে স্নেক অর্থাৎ যে সাপ নদী বন্যাবেগে দক্ষিণ থেকে বয়ে যায় নামের মর্যাদা সেও রেখেছে।

লিকলিকে সাপের মতো আঁকাবাঁকাই তার গতি নয়, এক এক জায়গায় দারুণ স্রোতের বেগে সঙ্কীর্ণ গিরিখাত-তোলপাড়করা ঘূর্ণিতে জল যেন বিষের ফেনায় শাদা করে তুলে তার প্রচণ্ড ঝাপটা

দিচ্ছে ছোবলের মতো।

এই দুরন্ত স্নেক নদী দিয়ে জেট বোটে উজানে যেতে যেতে বোটের ক্যাপ্টেন ডীন ম্যাকের কাছ থেকে ডাঃ লেভিনের কথা জানবার চেষ্টা করছিলাম।

এত জায়গা আর এত লোক থাকতে একটা প্রায় অজানা বিপজ্জনক গিরিখাতে নগণ্য একজন জেট বোটের ক্যাপ্টেনের কাছে ডাঃ লেভিনের খোঁজ করতে আসা একটু আহাম্মকি মনে হতে পারে কিন্তু খোঁজ খবর নেবার আর কোথাও কিছু তখন বাকি নেই বলেই শেষ এই হতাশ চেষ্টা।

ডাঃ লেভিন সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার আগে ওই হেল্‌স্ ক্যানিয়নেই এসেছিলেন। এসেছিলেন নাকি এখানকার গিরিখাতের একদিকের পাহাড়ের গায়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার কোন অজানা আদিবাসীদের খোদাই করা সব লেখা আর ছবি দেখার জন্য।

তিনি কি তাহলে এই দুরন্ত সাপ নদীর স্রোতে কোথাও ডুবে টুবে গেছেন নাকি? যা ভয়ঙ্কর গিরিখাত আর জলের তোড় তাতে সেরকম কেছু ঘটা অসম্ভব নয় মোটেই।

কিন্তু সেরকম কিছু যে হয় নি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। হেল্‌স্ ক্যানিয়নের অভিযান থেকে ফেরার পর তাঁকে স্বচক্ষে সেখান থেকে প্লেনে উঠতে দেখেছে এমন সাক্ষীর অভাব নেই। তা ছাড়া ডাঃ লেভিনের নিজের ল্যাবরেটরিতে রেখে যাওয়া তাঁর লেখা চিরকুটটাই যে এ সব কল্পনার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ।

ডাঃ লেভিন তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেই চোখে পড়ে এমন ভাবে একটা কাগজ এঁটে রেখে গিয়েছিলেন। সে কাগজে তাঁর নিজের হাতে যা লেখা তার মর্ম হল,—আমি স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হচ্ছি। কেউ যেন আমার খোঁজ না করে!

কিন্তু কেউ যেন খোঁজ না করে বলে লিখে গেলেই কি ডাঃ লেভিনের মতো মানুষের সম্বন্ধে তাঁর নিজের দেশ ও পৃথিবী হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে! খোঁজ তাই তখন থেকেই সমানে চলছে।

শুধু এত দিনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও ধরে এগোবার মতো একটা খেই-ও কোথাও পাওয়া যায়নি।

ডাঃ লেভিনের মতো মানুষের নিরুদ্দেশ হতে চাওয়াটাই যে অবিশ্বাস্য। জৈব রসায়নের অসামান্য গবেষক হিসেবে যাঁর নাম নোবেল প্রাইজ-এর জন্যে বহু জায়গা থেকে প্রস্তাবিত হয়েছে, অত্যন্ত আদর্শবাদী ও সফল বিজ্ঞানসাধক হিসেবে যাঁর জীবনে কোন দিকে কোন দুঃখের কিছু নেই, তিনি হঠাৎ স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হতে যাবেন কেন ? আর তা হয়ে থাকলে কোথায় বা গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন দুনিয়ার সেরা সন্ধানীদের চোখ এড়িয়ে ? রহস্যটা সত্যিই যেন একেবারে আজগুবি।

আমেরিকার এফ বি আই-ও কোন কিনারা করতে পারেনি বুঝি ? চোখে মুখে মুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

কই আর পারল !—ঘনাদা একটু করুণা ফোটালেন দৃষ্টিতে।

শিবু তোয়াজটা বাড়াবার জন্যে একটু উল্টো গাইলো,—জেম্‌স্ বণ্ডকে তো ডাকলে পারত !

আরে তা কি আর ডাকেনি !—শিশির ধমক দিল শিবুকে—তাতে কিছু হয়নি বলেই না শেষ পর্যন্ত ঘনাদার শরণ নিয়েছে ! না নিয়ে যাবে কোথায় ? ছাগল দিয়ে কি যব মাড়ানো চলে !

ঠিক বলেছ !—শিশিরকে গলা ছেড়ে সমর্থন করবার এমন সুযোগ আর ছাড়ি। বললাম—কিসে আর কিসে ! ধানে আর শিষে ! আরে জেম্‌স্ বণ্ড তো সেদিনের মাতব্বর। তার জন্ম হবার অন্তত বিশ বছর আগে ঘনাদা মশা মেরে নুড়ি তুলেছেন সে হুঁস কারুর আছে !

যেতে দাও, যেতে দাও ওসব কথা !—ঘনাদা উদার মহত্ত্বে নিজের প্রসঙ্গ চাপা দিলেন,—ব্যাপারটা হাতে নেবার পর থেকে আমিও কোথাও ছিটেফোঁটা একটা খেইও পাইনি। হতাশ হয়ে তাই তাঁর শেষ অভিযানের জায়গা সেই হেল্‌স্ ক্যানিয়নে গেছলাম হার স্বীকার করার আগে আর একটিবার অপ্রত্যাশিত কিছু সূত্র সেখানে মেলে কি না দেখতে।

যাওয়াই পণ্ডশ্রম মনে হয়েছে। স্নেক নদী দিয়ে জেট বোটে পাড়ি দেওয়ার উত্তেজনা মিলেছে যথেষ্ট, কিন্তু আসল লাভ কিছুই হয়নি। জেট বোটের ক্যাপ্টেন ডীন ম্যাককে নানারকমে জেরা করেও কোন ফল না পেয়ে নিজের বুদ্ধির ওপরই অবিশ্বাস এসেছে। মনে হয়েছে আমার এ চেষ্টাটাই পাগলামি। এত দিকের এত রকম সন্ধানে যে রহস্যের এতটুকু কিনারা হয়নি, তার খেই মিলবে ডাঃ লেভিনের মোটমাট এক দিনের একটা বোটের পাড়িতে ?

তাই কিন্তু মিলেছে আশাতীতভাবে অকস্মাৎ।

গিরিখাতের ধারের পাহাড়ের গায়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার লুপ্ত কোন জাতির খোদাই-এর কাজ দেখাতে দেখাতে ম্যাকে হঠাৎ বলেছে—আপনাদের ডাঃ লেভিন কিন্তু একটু ক্ষ্যাপাটে ছিলেন।

ম্যাকের এ কথায় বিশেষ কান দিইনি। ডাঃ লেভিনের মতো মানুষ সাধারণের কাছে একটু অদ্ভুত মনে হবেন এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ?

কিন্তু ম্যাকের পরের কথায় একটু চমকে উঠে কানটা খাড়া করতে হয়েছে।

ডাঃ লেভিন এইসব খোদাই দেখতে দেখতে কি বলেছিলেন জানেন ? ম্যাকে তখন আমায় শোনাচ্ছে,—বলছিলেন যে পৃথিবীটাকে আরো বড় করতে হবে, অনেক বড়। শুনে আমার তো তখন হাসি পাচ্ছে। পৃথিবী আবার বড় করবে কি ? পৃথিবী কি বেলুন যে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে বড় করবে ! তাঁর লোকটা কিন্তু খোসামোদ্ করে করে তাঁকে যেন তাতিয়ে বললে,—একা আপনিই তা পারেন হুজুর। এই পাহাড়ের খোদাইকার জাতের মতো কাউকে তাহলে আর দুনিয়া থেকে মুছে যেতে হবে না।

ম্যাকের মুখে ডাঃ লেভিনের পৃথিবী বড় করার কথা শুনেই তখন আমার মাথার ভেতর ভাবনার চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। তার ওপর আর একটা প্রশ্নও খোঁচা দিচ্ছে অবাক করে। ডাঃ লেভিনের লোকটা আবার কে ? তাঁর সঙ্গে কেউ কি আরো ছিল ?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম ম্যাকেকে। ম্যাকের কাছে যা জানলাম তা এমন কিছু অদ্ভুত নয়। ডাঃ লেভিনের সঙ্গে তাঁর একজন অনুচর গোছের ছিল। অমন অনুচর থাকাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ডাঃ লেভিনের অন্তর্ধান সম্বন্ধে যা যা বিবরণ আমায় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এরকম অনুচরের বক্তব্যও কি থাকা উচিত ছিল না? যত তুচ্ছই হোক এ বিষয়ে কারুর কথাই তো উপেক্ষা করবার নয়।

আগেকার সন্ধানের এ ত্রুটি শোধরাতে হবে ঠিক করে আসল কাজের জন্যে আইডাহোর রাজধানী বয়েস্-এ ডাঃ লেভিনের নিজের ল্যাবরেটরিতেই গিয়ে হাজির হলাম। তারপর তাঁর সহকারীদের সাহায্যে তন্ন তন্ন করে ডাঃ লেভিন সম্প্রতি যে গবেষণার কাজে মেতে ছিলেন তার সন্ধান নিতে কিছু বাকি রাখলাম না।

যা আঁচ করেছিলাম সে রকম কিছু সত্যিই তার মধ্যে পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁর সঙ্গে যে অনুচর হেলস্ ক্যানিয়ন-এ স্নেক নদীর পাড়িতে গেয়েছিল, তার সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না। লোকটার কোন পাত্তাই নেই। ডাঃ লেভিন একা তাঁর যে বাসায় থাকতেন সেখানে তাঁর নিয়মিত জ্যানিটরের বদলি লোকটা নাকি কিছুদিন মাত্র কাজ করেছিল। নেহাৎ ক'দিনের বদলি বলে তার সম্বন্ধে খোঁজ খবরের কথা কেউ ভাবেনি।

ডাঃ লেভিনের আসল জ্যানিটরও লোকটা সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারল না। সে ক'দিনের ছুটিতে যাবার সময় তাদের ইউনিয়ন থেকেই চিঠি নিয়ে লোকটা নাকি বদলিতে এসেছিল। জ্যানিটরের কাছে অনেক কষ্টে লোকটার নামটা শুধু উদ্ধার করা গেল।

সে নামটা বেশ অবাক করবার মত। নাম হল মালাঞ্জা এমপালে।

নাম শুনেই সন্দিগ্ধ ভাবে জ্যানিটরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—নামটা ঠিক তোমার মনে আছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—বলেছিল জ্যানিটর,—নামটা অদ্ভুত বলেই মনে আছে। আমাদের এ দিকে আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান, কাফ্রি ও

কিছু কিছু এস্কিমোও আছে। তাদের নানা রকম মজার নামের ভেতর এরকম বেয়াড়া নাম কখনো পাইনি।

মালাঞ্জা এমপালে যার নাম বলছ, সে লোকটা কি চেহারায় কাফ্রি, আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান বা এস্কিমোদের মত? এবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আজ্ঞে না,—বলেছিল জ্যানিটর,—নামটা উদ্ভুট্টে হলেও চেহারায় আমাদেরই মত!

নাম মালাঞ্জা এমপালে, অথচ চেহারায় য়ূরোপীয় এই রহস্যটা মাথায় নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিলাম।

তারপর ডাঃ লেভিনের ল্যাবরেটরির কাগজপত্র ঘেঁটে যা পেয়েছি আর মালাঞ্জা এমপালে নাম থেকে যা হদিস মিলেছে তাই সম্বল করে বারো আনা পৃথিবী ঘুরে একবার ফিলিপাইনস্ আর তারপর উত্তর বর্মা হয়ে সোজা জা-ঈর-এ গিয়ে রাজধানী কিনশাসা. আর কানাঙ্গা হয়ে এমবুজি মাঈতে এসে উঠলাম।

দুই-এ দুই-এ চার জুড়তে ভুল যে আমার হয়নি দুদিন ওই ছোট শহরে একটু শোরগোল তোলবার পরই তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

ওখানকার প্রধান মাইনিং কোম্পানীর ম্যানেজারের সুপারিশেই হোটেলের বদলে সাংকুরু নদীর ধারে নির্জন একটা ছোট বাংলো বাড়িতে থাকবার সুবিধে পেয়েছিলাম। তিন দিনের দিন সন্ধ্যার পর সেই বাংলোতেই এক দর্শনপ্রার্থী এসে হাজির।

কেউ একজন আসবে বলেই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু আমার চাকরের আনা কার্ডে যে নামটা ছাপানো সেটা আমার কাছেও অপ্রত্যাশিত।

নামটা মালাঞ্জা এমপালে!

চাকরকে তক্ষুনি রাত্রের মত ছুটি দিয়ে আগন্তুককে বসবার ঘরে ডাকলাম।

কার্ডের নামটা পড়ে যেমন মানুষটাকে স্বচক্ষে দেখে তেমনি

অবাক হতে হল।

ইডাহো-র রাজধানীতে ডাঃ লেভিনের বাসার জ্যানিটরের কাছে যার বর্ণনা শুনেছিলাম তার সঙ্গে এ লোকটির তো কোনো মিল নেই। সে লোকটির শুনেছিলাম য়ুরোপিয়ানদের মত ফর্সা চেহারা। আর এ লোকটি পোশাক আশাক থেকে চেহারাতেও ঝামা ইটের রং-এর বান্টু।

কথাবার্তা আর উচ্চারণে কিন্তু নির্ভুল ফ্লেমিশ।

সেই ভাষাতেই প্রথম ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলে,—খুব অবাক হয়েছেন না মঁশিয়ে দাশ ?

তা একটু হয়েছি!—যেন লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলাম।

কিসে অবাক হয়েছেন ? আমার ঘাড়ের ওপর সচাপ্টে একটা হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে এমপালে—এত তাড়াতাড়ি হাজির হয়েছি বলে ?

না।—কাঁধ থেকে তার হাতের চাপটা সরাবার যেন বৃথা চেষ্টা করে একটু অস্বস্তি দেখিয়ে বললাম—আপনাকে খোঁজার জন্যে আমার যত গরজ, আপনার আমাকে খোঁজার গরজও যে তার চেয়ে কম নয় তা জানতাম। তবে নিজেই প্রথমে দর্শন দেবেন এটা আশা করতে পারিনি, আর গায়ের রংটা ইডাহো থেকে জা-ঈরে এসেই রোদে পুড়ে এতটা পাল্টাবে সেটা ধারণার মধ্যে ছিল না।

যা দরকারী তা অন্যকে দিয়ে আমি করাই না।—মালাঙ্গা এমপালে আমার এক কাঁধ ছেড়ে আর কাঁধে চাপ দিয়ে বললে,—আর এই আমার আসল রং। ইডাহোতে যা লোকে দেখেছে সে রং মেক্-আপ করা নকল কিন্তু ইডাহো থেকে আপনি এই জা-ঈরে আমার খোঁজে এলেন কি করে ?

সামান্য একটু বুদ্ধি তার জন্যে খাটাতে হয়েছে।—আবার যেন এমপালের হাতের চাপটা সরাতে গিয়ে হার মেনে কাতর গলায় বললাম,—তা ছাড়া আপনি নিজেই একটা সোজা স্পষ্ট খেই রেখে এসেছিলেন কিনা!

আমি সোজা স্পষ্ট খেই রেখে এসেছিলাম। সত্যিই চমকে উঠে কাঁধের ওপর চাপ দেওয়া ছেড়ে আমার নড়া ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে,—কি খেই?

আজ্ঞে, আপনার নামটা!—গলাটা যেন যন্ত্রণায় নাড়তে নাড়তে বললাম।

আমার নামটা!—আর ভদ্রতার মুখোশ না রাখতে পেরে এমপালে হিংস্র গলায় জিজ্ঞাসা করলে,—ওই নাম থেকে তুই এখানে আমার খোঁজ করতে আসার হদিস্ পেয়েছিস?

শুধু আপনাকে নয়, আপনি যাকে সঙ্গে এনে লুকিয়ে রেখেছেন সেই ডাঃ লেভিনকে খোঁজ করার হদিস্ও ওই নামটা থেকে অনেকটা পেয়েছি!—যেন ভয়ে ভয়ে বললাম—বাকিটা পেয়েছি ডাঃ লেভিনের ল্যাবরেটরির কাজ কর্ম দেখে আর হেলস্ ক্যানিয়নে তাঁর একটা বাতুল ইচ্ছের কথা জেনে।

আমার কথায় হতভম্ব হয়ে এমপালে এবার বোধ হয় আমায় শারীরিক শাস্তি দিতে ভুলে গেল। শুধু দাঁত খিঁচিয়ে জানতে চাইলে,—ওসব বাজে বাকতাল্লা ছেড়ে আমার নাম শুনে কি করে এখানে এলি তাই আগে বল্!

আজ্ঞে! এটা আপনার কাছে এত শক্ত মনে হচ্ছে কেন? একটু রেহাই পেয়ে যেন সভয়ে একটা দেয়ালের দিকে ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম,—দুনিয়ার সব জায়গার নামের বিশেষত্ব আছে জানেন তো! আপনাদের এই অঞ্চলেরই পশ্চিম টাঙ্গানাইকা হ্রদের ওপরে টানজানিয়ার কি দক্ষিণ পূবে জাম্‌বিয়ায় যে ধরনের নাম জা-ঈয়ের নামের ধরন তা থেকে আলাদা। মালাঙ্গা এমপালে শুনেই তাই বুঝেছিলাম আসল বা ছদ্মনাম যা-ই হোক নামটা এই জা-ঈর অঞ্চলের। এ নাম যে নিয়েছে জা-ঈর-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক যে নিশ্চিত আছে ডাঃ লেভিনের গবেষণার ধারা জেনে আর তাঁর পৃথিবী বড় করার ইচ্ছের কথা শুনে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হই।

আমার নাম শুনে জায়গাটা না হয় আঁচ করেছিস্ বুঝলাম, কিন্তু

ডাঃ লেভিনের পৃথিবী বড় করার ইচ্ছে থেকেই নিশ্চিত বুঝলি আমরা জা-ঈরে এসেছি! চালাকি করবার আর জায়গা পাসনি!—হতভম্ব থাকার দরুনই এবারও এমপালে আমায় মারধোর দেবার চেষ্টা করলে না।

চালাকি করবার এই ত এখন জায়গা!—একটু যেন সাহস পেয়েছি ভাব দেখিয়ে জোর গলায় বললাম,—আর পৃথিবী বড় করার মত আশ্চর্য চালাকি এই জা-ঈর ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব নয়। তাই জেনেই ডাঃ লেভিনকে বোঝাতে এখানে তাঁর খোঁজে এসেছি।

সে খোঁজ তাহলে তোকে ছাড়তে হবে!—এবার আর দাঁত খিঁচুনি নয়, এমপালের গলায় যেন বজ্রের হুমকি,—কোথায় তোর দেশ জানি না। তা যে চুলোতেই হোক, ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যা।

আমার ঘর যে বড় দূর!—যেন দুঃখের সঙ্গেই বললাম,—সেই গোটা আফ্রিকা আর আরব সাগর পার হবার পরও যেতে হবে ভারতবর্ষের একেবারে পূব প্রান্তে। তার চেয়ে আপনার ঘরে ফিরে যাওয়াই সোজা নয়? প্লেন যদি না জোটে তাহলে মাতাদি-র বন্দর থেকে জাহাজে চেপে সোজা উত্তরে আপনার বেলজিয়মে গিয়ে পৌঁছোতে পারেন। অবশ্য বেলজিয়ম যদি আপনার আসল দেশ হয়। আমায় মঁসিয়ে বলে সম্বোধন করেও যেরকম ভাঙা ফ্লেমিশ-এ কথা বলছেন তাতে মনে হয় বেলজিয়মও আপনার দেশ নয়। যুদ্ধে হারবার পর শয়তান নাৎসীদের অনেকে অসংখ্য পাপের শাস্তির ভয়ে দেশ বিদেশে পালিয়ে লুকিয়ে আছে শুনেছি। কে জানে আপনি তাদেরই একজন কি না, পৈশাচিক এক মতলব নিয়ে ছদ্মনামে আর চেহারায় এই ঘোর জঙ্গলের দেশে পড়ে আছেন! এখন চলে গেলে ডাঃ লেভিনকে তাঁর স্বপ্ন আর আদর্শের টোপ দিয়েই ভুলিয়ে নিয়ে এসে সে মতলব হাসিল করা আপনার আর হয়ে উঠবে না বটে, তবে আমি যখন এসে গেছি তখন সে উদ্দেশ্য সফল তো আপনার

আর হবার নয়। তাই ভালোয় ভালোয় আপনারই এখন চলে যাওয়া ভালো। বেলজিয়মে জায়গা না জোটে জা-ঈর ছেড়ে যেখানে খুশি গেলেই হবে। জা-ঈর-এর ইতুরি-র জঙ্গলের অন্তত ধারে কাছে থাকবেন না।

ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে গেলেও শুধু আমি কতটা কি ধরে ফেলেছি তা জানবার অদম্য কৌতূহলেই নিশ্চয়, আমার দীর্ঘ বক্তৃতায় এতক্ষণ কোন বাধা দেয়নি মালাঞ্জা। এবার ইতুরি কথাটা আমার মুখ থেকে খসতেই একেবারে বোমার মত সে ফেটে পড়ল।

ইতুরি! কি জানিস তুই ইতুরির ?—এমপালে চোখের আগুনেই আমায় যেন ভস্ম করবে!

কিছুই এখনো জানি না।—সহজ সরল ভাবে ভালোমানুষের মত বললাম,—শুধু অনুমান করছি যে পৃথিবী বড় করবার পরীক্ষা চালাবার পক্ষে ইতুরির চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারে না! সেইখানেই আপনার গুপ্ত ঘাঁটি বসিয়ে ডাঃ লেভিনকে এনে রেখেছেন মনে হচ্ছে···

আর কিছু বলতে হল না। জা-ঈরের দুর্দান্ত পাহাড়ী গেরিলার মতই মণ পাঁচেক কয়লার বস্তার ভার নিয়ে এমপালে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দড়াম করে একটা শব্দ হল দেয়ালে। বেচারার মাথাটা ফেটে রক্তারক্তি।

ধরে তুলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সুযোগ দিলে না। মালাঞ্জার জেদ আছে বটে। ফাটা মাথা নিয়েই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। একবার দুবার নয় পাঁচ পাঁচবার। কপাল মাথা কিছু আর আস্ত রইল না।

বেচারার আর দোষ কি ? আমায় তাগ্ করে যেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেখানে শুধু দেয়ালের সঙ্গেই মোলাকাৎ হয়। আমি তার আগেই সরে গেছি।

পাঁচ পাঁচবার এমনি দেয়ালবাজি দেখাবার পর সত্যিই ধরে

তুলতে হল মালাঙ্গাকে। ধরে তুলে আমার চেয়ারটাতেই বসিয়ে দিয়ে বললাম,—আমি বড়ই দুঃখিত, হের মালাঙ্গা। এ বাংলো-বাড়ির দেয়ালে গদি আঁটা থাকা উচিত ছিল।

আমিও দুঃখিত যে,—ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে মালাঙ্গা এমপালে,—আমার কথাটা আপনাকে ঠিক বোঝাতেই পারিনি। আমি এতক্ষণে শুধু আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম মিঃ দাশ? ডাঃ লেভিনের নিজের হুকুমেই এত কড়া পরীক্ষা করতে হয়েছে। বুঝতেই তো পারছেন, ডাঃ লেভিন যা করতে যাচ্ছেন অমন আশ্চর্য একটা গবেষণার কথা একেবারে ষোল আনা খাঁটি মানুষ ছাড়া কাউকে জানানো যায়! আপনাকে এখান থেকে ডাঃ লেভিনের কাছেই নিয়ে যাবার জন্যে আমি এসেছি, পরীক্ষাটা আগে শুধু করে নিলাম।

আমায় পরীক্ষা করেছিলেন?—চোখ দুটো আপনা থেকেই কপালে উঠল।

অবাক হবার তখনও কিছু তবু বাকি।

মালাঙ্গা যন্ত্রণায় মুখটা একটু বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে,—হ্যাঁ, সে পরীক্ষা আমার শেষ হয়েছে, শুধু শেষ হুঁশিয়ার করাটা এখনো বাকি। এখান থেকে আপনার যাবার আসল বাধাটা তাই কাটিয়ে দিই।

আসল বাধা?—সন্দিগ্ধ ভাবে বললাম,—সে আবার কি?

এই দেখুন না!—বলে মালাঙ্গা এবার যা দেখালো তা সত্যি তাজ্জব করার মত ব্যাপার।

গাছ থেকে ফুল তোলার মত আমার মাথা মুখ নাক কান হাতা পকেট যেখানে খুশি হাত দিয়ে সে একটার পর একটা ছোট বড় হীরে বার করে আনতে লাগল।

তারপর সেগুলো সামনের টেবিলে রেখে ওই রক্ত-মাখা মুখেই একটু কাৎরানির হাসি হেসে বললে,—যতই আপনি ম্যানেজারের বন্ধু হন এই সব চোরাই হীরে নিয়ে আপনি এমবুজি মাঈ ছেড়ে যেতে পারতেন! এবার বুঝতে পারছেন আমি আপনার বন্ধু না শত্রু!

শত্রু হলে এই সব হীরে দিয়েই আপনাকে আমি ধরিয়ে দিতাম না?

আমার মুখে তখন আর কথা নেই। এ ম্যাজিকের পর আর বলার কিই বা থাকতে পারে?

শত্রু না বন্ধু মালাঙ্গার সঙ্গেই তারপর এমবুজি মাঈ থেকে বোয়ামা জলপ্রপাতের শহর কিসান্‌গানি হয়ে এপুলু গেলাম। সেখান থেকে দুনিয়ার সব চেয়ে রহস্যময় জঙ্গল ইতুরি। ইতুরির জঙ্গলে মালাঙ্গার সাধ্য নেই একা পথ চিনে যাবার। তাই সেখো নেওয়া হল মাকুবাসি নামে ইতুরির বিখ্যাত বামন জাতের এক সর্দারকে! মাকুবাসি মাথায় চার ফুটের বেশী লম্বা নয়, পরনে তার নেংটি। হাতে যেন খেলাঘরের একটা ছোট ধনুক। কিন্তু যেমন সে ধনুকের তীরের অজানা অব্যর্থ বিষ তেমনি আশ্চর্য তার সব ক্ষমতা। গহন জঙ্গলের সঙ্গে তার যেন গোপন দোস্তি আছে এমনি তার সেখানকার সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান।

এই মাকুবাসিকেও কিন্তু মালাঙ্গার বিশ্বাস নেই। দুদিন মাকুবাসির কথা মত চলবার পর তিন দিনের দিন এক জায়গায় রাত কাটিয়ে ভোর না হতেই মালাঙ্গা আমায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললে, —এবার আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে দাস!

হেসে বললাম, এতক্ষণ কি শুধু আরাম করেছি?

না, না,—লজ্জিত হয়ে বললে মালাঙ্গা,—এবার খানিকটা পথ আপনাকে ও আমাকে একলা একলা আলাদা যেতে হবে। মাকুবাসি রাত থাকতেই উঠে জালে শিকার ধরতে গেছে। সে আসবার আগেই আমাদের পালাতে হবে। ডাঃ লেভিনের গোপন আস্তানা ওই 'বামন' জাতের কাউকেও আমরা জানাতে চাই না।

একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—একলা অমন কতদূর যেতে হবে? পথ চিনতে পারবো তো!

খুব পারবেন!—ভরসা দিলে মালাঙ্গা,—এখান থেকে সোজা গেলেই মাইল খানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড বাওবাব দেখতে পাবেন। সেই বাওবাবের প্রকাণ্ড একটা কোটরের ভেতর দিয়ে মাত্র মিনিট

ছুই-এর একটা সুড়ঙ্গ, ডাঃ লেভিনের গোপন আস্তানায় যাবার রাস্তা। আমি ভিন্ন রাস্তায় সেখানেই যাচ্ছি। আপনি আগে বেরিয়ে পড়ুন। কোন ভাবনা নেই। শুধু একটু দেখে শুনে যাবেন মাকুবাসির নজরে না পড়েন।

দেখে শুনেই যাচ্ছিলাম। তাতে এক মাইলও যেতে হল না। তার আগেই মাকুবাসির নজরে পড়ে যাব কে জানত!

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোন রকমে পথ করে যাচ্ছি হঠাৎ পেছনে জামায় টান পড়ে থেমে যেতে হল। ফিরে তাকিয়ে দেখি কাঁধে এমবোলোকো নামে ছোট্ট ক্ষুদে একটা নীল হরিণ নিয়ে মাকুবাসি। সে উত্তেজিত ভাষায় যা বলল তা প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। বোঝাবার জন্যেই কাঁধের ছোট্ট নীল হরিণটা সে আমার সামনে এক পা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

বুঝতে আর তখন কিছু বাকি রইল না। হরিণটা সেখানে পড়া মাত্র মাটির ওপর পাতা জংলী-লতার ফাঁস তার পা দুটোতে জম্পেশ করে আটকে তাকে এক ঝটকায় শূন্যে ঝুলিয়ে দিলে। মাকুবাসি মোক্ষম সময়ে টেনে না ধরলে ইতুরির জংলী বামনদের ফাঁদে আমারও ওই অবস্থাই হত।

মাকুবাসি তার হরিণটা ঝোলানো ফাঁদ থেকে ছাড়িয়ে তখুনি আমাদের রাতের আস্তানায় ফিরে যেতে চাইছিল, তাকে তা দিলাম না। কোন রকমে আমার মনের কথাটা তাকে বুঝিয়ে রাত পর্যন্ত তাকে রেখে দিলাম সঙ্গে।

তারপর···

হ্যাঁ, তারপর নাটকের শেষ দৃশ্যটা একরকম জমাটিই হল।

ইতুরির জঙ্গলের মাঝখানে সত্যিই বেশ মজবুত করে তৈরী বাঁশ বেত আর জংলী লতাপাতার একটা ছোটখাটো বাসা। তার একটা ঘর গবেষণাগারের সাজ সরঞ্জামেই সাজানো। কি কষ্ট করে শুধু সে সমস্ত লটবহর নয়, ঘরের জোরালো হ্যাসাক বাতিটাও আনানো হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়।

অবাক হতে হয় সেখানকার দুটি মানুষের আলাপ শুনেও। তাদের একজন ডাঃ লেভিন, আরেকজন মালাঞ্জা এমপালে।

ডঃ লেভিন তখন জিজ্ঞাসা করছেন—যাঁর খোঁজে গিয়েছিলে বলছ, সত্যিই তাঁর দেখাই পেলে না। তিনি তো আমাদের বন্ধু বলছ।

হ্যাঁ পরম বন্ধু!—হতাশভাবে বললে মালাঞ্জা,—তিনি এলে অনেক উপকার আমাদের হত। তাই গোপনে খবর পাঠিয়ে তাঁকে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতুরির জঙ্গলের ভয়েই বোধহয় আসতে পারলেন না।

না, ঠিকই এসেছি মালাঞ্জা, আর বোধহয় ঠিক সময়ে। নমস্কার ডাঃ লেভিন।

বাইরের বেতের দরজা প্রায় ভেঙে আমায় হঠাৎ ঢুকতে দেখে মালাঞ্জা আর ডাঃ লেভিন দুজনেই একেবারে স্তম্ভিত হতবাক।

তার মধ্যে ডাঃ লেভিনই প্রথম চাঙ্গা হয়ে বললেন,—একি তুমি মিঃ দাস? তোমায় আনতে গিয়ে মালাঞ্জা খুঁজে পাইনি! তুমি যে আমার খোঁজে আসছ তা আগে আমায় বলেনি কেন?

বলেনি একটু বাধা ছিল বলে বোধহয়,—হেসে মালাঞ্জার দিকে তাকিয়ে বললাম,—প্রথমত আপনার সঙ্গে আমার যে পরিচয় বহুদিনের তা ওর জানা ছিল না, দ্বিতীয়ত আগে থাকতে বললে ইতুরির ঝোলানো ফাঁসে আমাকে লটকাবার ব্যবস্থা করা যেত না।

ফাঁসে—লটকানো? কী বলছ তুমি দাস? ডাঃ লেভিন ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন,—তোমাকে ঝোলানো ফাঁসে লটকাতে যাবে কেন মালাঞ্জা?

যাবে, আমার মত পথের কাঁটা না সরালে ওর আসল মতলব হাসিল হবে না তাই। কি বলো মালাঞ্জা? মালাঞ্জার দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম।

মালাঞ্জা একেবারে চুপ। তার বদলে ডাঃ লেভিনই বিমূঢ় এবং একটু উত্তেজিত গলায় বললেন,—কী তুমি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না দাস। আমার এই একান্ত লুকোনো আস্তানায় খোঁজ পাওয়াই

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তোমার অসাধ্য কিছু নেই বলেই তা তুমি পেয়েছ বুঝলাম, কিন্তু সে খোঁজ পাবার পর আমার একান্ত বিশ্বাসের সহকারী সম্বন্ধে এ সব মিথ্যা অভিযোগ করতেই কি তুমি এসেছ!

মিথ্যা অভিযোগ নয় ডাঃ লেভিন, সব সত্য।—এবার গম্ভীর হয়ে বললাম,—কিন্তু শুধু তার জন্যে আমি আসিনি। আমি এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে।

আমায় নিয়ে যেতে!—ডাঃ লেভিন এবার গরম হলেন,—আমায় তুমি নিয়ে যেতে চাইলেই আমি যাব? আমি কি জন্যে এখানে এসেছি তা তুমি জানো?

তা জানি বলেই আপনাকে নিয়ে যেতে চাই।—কঠিন হয়ে এবার বললাম,—আর আপনার সন্ধান যে পেয়েছি তা আপনার নিরুদ্দেশ হবার কারণ থেকেই। শুনুন ডাঃ লেভিন, আপনি মস্ত বৈজ্ঞানিক, সেই সঙ্গে পৃথিবীতে স্বর্গের স্বপ্ন দেখা কবি। আপনি পৃথিবীকে আরো বড় করতে চান মানুষের ভালোর জন্যে।

হ্যাঁ—এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ডাঃ লেভিন, মানুষের এত সব সমস্যা, জাতিতে জাতিতে এত মারামারি কাটাকাটি শুধু পৃথিবীতে এখন জায়গার অভাব বলে। পৃথিবী বড় করতে পারলে মানুষের বারো আনা সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে।

আপনি পৃথিবীকে বড় করতে চান জেনেই,—ডাঃ লেভিনকে বাধা দিয়ে থামিয়ে বললাম,—কোথায় আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে পারেন তার নিশ্চিত হদিস পেয়েছি।

কেমন করে? ডাঃ লেভিন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম,—পেয়েছি, পৃথিবী বড় করার আসল রহস্যটা বুঝে। পৃথিবী তো সত্যি বেলুনের মত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করা যায় না। পৃথিবী যা আছে তাই থাকবে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীকে আরো বিস্তৃত করতে হলে মানুষকে ছোট করতে হয় এই বুদ্ধি আপনার মাথায় এসেছে। মানুষ যদি এখনকার মাপের বদলে সমস্ত বর্তমান বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে ছোট হতে হতে ইঁদুর আর তারও পরে পিঁপড়ের মত

ছোট হয়ে যায়—তাহলে পৃথিবী তার পক্ষে কি বিরাটই না হয়ে যাবে। তাই ভেবেই আপনার জৈব-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে আকারে ছোট করার উপায় আপনি খুঁজতে সুরু করেছেন। সে খোঁজে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর এই একটি দেশ জা-ঈরের ইতুরি জঙ্গলে আপনাকে আসতেই হবে।

কেন আসতে হবে তা তুমি বুঝেছ?—ডাঃ লেভিন বেশ একটু মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে চাইলেন।

হ্যাঁ, কিছুটা তার বুঝেছি ডাঃ লেভিন,—বিনীতভাবেই জানালাম,—পৃথিবীতে বামন জাত, বামন প্রাণী অনেক জায়গাতেই আছে, কিন্তু জা-ঈরের এই ইতুরির জঙ্গল যেন সে রহস্যের আসল ঘাঁটি। এখানে শুধু আদ্যিকালের এক বামন জাতের মানুষই নেই, এখানকার আরো অনেক কিছুর আকার ছোটর দিকে, যেমন এখানকার ক্ষুদে লাল মোষ, বামন হাতি ইত্যাদ। এখানকার মাটি আর জলে সুতরাং আকার কমাবার কোনো রহস্য লুকোন আছে। নিজের গবেষণায় যা জেনেছেন তার সঙ্গে এখানকার রহস্যও আপনার না জানলে নয়।

সবই বুঝলাম—এবার ডাঃ লেভিন আবার একটু সন্দিগ্ধ গলায় বললেন,—কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাসী সহকারী মালাঞ্জার বিরুদ্ধে তোমার ওসব অভিযোগ কেন?

প্রথমত ও সত্যি মালাঞ্জা এমপালে নয় বলে,—মালাঞ্জার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে এবার বললাম,—দ্বিতীয়ত আপনার গবেষণার ফল ও নিজের লাভেই লাগাবে বলে মতলব করে আপনাকে এখানে এনেছে বলে অভিযোগ।

এসব কথা তুমি কিসের জোরে বলছ দাস? ডাঃ লেভিনের গলা এবার কঠিন হল।

বলছি কিসের জোরে এই দেখুন!—মালাঞ্জার নাক মুখ চোখ থেকে টুক টুক করে যেন ফুল ছেঁড়ার মত হীরে টেনে বার করতে করতে বললাম,—মালাঞ্জা চোর। এমবুজি মাঈ থেকে ও এমনি

করে হীরে পাচার করে এনেছে।

ঘনাদার কথা শুনে যত না, তার কাণ্ড থেকে তখন আমরা সবাই থ। করছেন কি ঘনাদা? মালাঞ্জার নাক মুখ থেকে হীরে বার করা দেখাতে গিয়ে আমাদের দুর্বাসার জটাজুট দাড়ি থেকেই যে মার্বেলের গুলি আর তার সঙ্গে ক'টা আস্ত ডিম বার করে ফেললেন।

সে সব মার্বেল আর ডিম টেবিলের ওপর রেখে ঘনাদা আবার বললেন,—হীরেগুলো বার করবার পর ঘরের একটা তাক থেকে একটু স্পিরিট হাতে লাগিয়ে মালাঞ্জার গালে একটু জোরে একটা আঙুল ঘসতে যেতেই ডাঃ লেভিন হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

আমি আঙুল ঘসতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ধমক দিয়ে বললেন,—আরে করছ কি দাস! মালাঞ্জা যে গায়ে পেণ্ট করে ইডাহোতে সাহেব সেজেছিল তা ও আমার কাছে স্বীকার করেছে।

না, ডাঃ লেভিন,—আঙুলটা ভালো করে মালাঞ্জার গায়ে ঘসে তুলে নিয়ে বললাম,—মালাঞ্জার এখনকার রংটাই পেণ্ট করা কি না এই দেখুন। আসলে ও একজন য়ুরোপীয়ান, হয়ত ফেরারী নাৎসী। আপনার গবেষণা সফল হলে তাই দিয়ে পৃথিবীর কি সর্বনাশ করা ওর মতলব কে জানে! আপনাকে তাই আমার সঙ্গে চলে আসতে হবে।

কেমন যেন বিহ্বল দিশাহারা হয়ে ডাঃ লেভিন বললেন—কিন্তু আমার গবেষণা, আমার স্বপ্ন···?

আপনার গবেষণা আপনার স্বপ্ন মানুষের পক্ষে সর্বনাশা ডাঃ লেভিন!—সহানুভূতির সঙ্গেই বললাম,—মানুষকে আকারে ছোট করলেই তার বেশীর ভাগ সমস্যা মিটবে এ কথা ভাবা আপনার ভুল। শুধু পৃথিবীই তার পক্ষে বিশাল করলে চলবে না, মানুষের মনটাকেও সেই সঙ্গে আরো বড় আরো উদার করতে হবে। তার উপায় যত দিন না হয় ততদিন পৃথিবীর বদলে সারা ব্রহ্মাণ্ড পেলেও মানুষের সমস্যা মিটবে না। যা ভুল করতে যাচ্ছিলেন তা ছেড়ে এখন আমার সঙ্গে চলুন।

চলুন!—হঠাৎ হা হা করে হেসে দাঁড়িয়ে উঠল মালাঞ্জা,—খুব

তো বড় বড় কথা শোনালে দাস। কিন্তু চলুন বললেই কি এই ইতুরির জঙ্গল থেকে যাওয়া যায়! আমি ফেরারী নাৎসী বা যে-ই হই, যে গবেষণার জন্যে ডাঃ লেভিনকে এখানে এনেছি তা শেষ না করা পর্যন্ত এখান থেকে এক পা ওঁকে যেতে দেব না। সেই সংগে তোমাকেও যে এখানে বন্দী থাকতে হবে তা বুঝতে পারছ দাস ?

ঠিক পারছি না তো ?—একটু হেসে ইসারা করার সঙ্গে মাকুবাসি ঘরে এসে ঢুকতেই তাকে দেখিয়ে বললাম,—বরং মনে হচ্ছে চলুন বললেই ইতুরি থেকে যাওয়া যায়। তবে তোমার যখন ইতুরির ওপর এত মায়া তখন তোমাকেই কিছুদিন এখানে রাখবার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। ভয় নেই আলগা করেই বাঁধন দেব। একটু চেষ্টা করলে একদিনের মধ্যেই যাতে খুলতে পারো।

মালাঞ্জা এমপালেকে সেইরকম ভাবে বেঁধেই সেখান থেকে ডাঃ লেভিনকে নিয়ে মাকুবাসিকে গাইড নিয়ে চলে এসেছিলাম। মাকুবাসিকে ফিরে গিয়ে মালাঞ্জার খোঁজ নিতে বলতেও ভুলিনি।

ঘনাদা কথাগুলো শেষ করেই আচমকা উঠে পড়ে ঘর থেকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন। যেতে যেতে দরজার কাছ থেকে ফিরে শুধু বলে গেছেন,—ছাদের সংগে বাঁধা কালো সুতোটা এখনও ঝুলছে। ওটা ছিঁড়ে ফেলো। আর তোমাদের ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জটাজুট দাড়ি গোঁফ একটু খুলে আরাম করে বসতে বলো। যা গরম।

টঙের ঘরের সিঁড়িতে ঘনাদার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেছে। আমরা তখন চোরের মত এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি।

দুর্বাসার দিকে চাইতেই চোখ উঠতে চাইছে না।

অত সাজগোজ শেখানো পড়ানোর পর অমন নাকাল হয়ে যা কটমট করে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে!

এরপর তাদের ক্লাব থেকে আর কাউকে কোনদিন কিছু সাজিয়ে আনা যাবে!

ঘনাদার ধনুর্ভঙ্গ

আবার সেই ভুল।

আর সেই ভুলেই বুঝি বাহাত্তর নম্বরের বারোটা বেজে যায়!

সবাই তখন আফশোসে হাত কামড়াচ্ছি আর গালাগাল দিচ্ছি পরস্পরকে!

সব দোষ তো এই আহাম্মকের!—শিবু আমার ওপরই গায়ের ঝাল ঝাড়ছে মেসের খরচার দিকটাও তো ভাবতে হবে—বলেছিলেন। ভাবো এখন খরচার দিক! বাহাত্তর নম্বরই এখন যে খরচার খাতায়!

আর তুমি!—আমিও পালটা ঘা দিতে ছাড়ছি না,—সুপারিশটা কে করেছিল? তুমি না? না, না খুব ভাল ছেলে! সাত চড়ে রা নেই। শুধু পড়াশুনা নিয়েই নাকি রাতদিন থাকবে। আমরা টেরই পাব না কেউ আছে! কেমন? টের কি এখনও পাওয়া যাচ্ছে!

শিবুকে দুষে কি হবে! শিশির শিবুর পক্ষ নিচ্ছে,—আসল আসামী তো গৌর। শিবু তো ওর গ্রামোফোন ছাড়া কিছু নয়। গৌর যা গায় তাই ও বাজায়! গৌরই তো খবর এনেছে প্রথম। ওঁর মোহনবাগানের সি-টিমের কোন হবু প্লেয়ারের মাসির সইয়ের বকুল ফুলের ভাগনে না ভাইপো শুনেই গদগদ হয়ে লাইন ক্লিয়ার লিখে দিয়েছেন।

আমি না হয় রেফারেন্স ভুল করেছি, আর উনি বুঝি একেবারে ধোয়া তুলসি পাতাটি! গৌর শিশিরকে ভেঙাচ্ছে,—চেহারা দেখেই উনি চরিত্র গুণে বলে দিতে পারেন! দেখিস বাহাত্তর নম্বরের একেবারে আদর্শ বোর্ডার হবে! কি বিনয়! কি আদব-কায়দা দুরস্ত! ঘনাদাকে পর্যন্ত দু'দিনে মোহিত করে দিয়েছে। সামলাও এবার তোমার মোহিত মোহনকে!

হ্যাঁ, ওই মোহিত করার জ্বালাতে জ্বলেই নিরুপায় হয়ে নিজেরা খাওয়া-খাওয়ি করে মরছি। সেই সঙ্গে দু'-দু'বার ঠেকেও কিছু না শিখে সেই পুরাণো ভুলটা করার জন্যে ধিক্কার দিচ্ছি নিজেদের।

সত্যি তিন তিনবার এমন ভুলটা কি বলে করলাম!

হাঁস খাইয়ে পেটে যে চড়া পড়িয়ে দিয়েছিল সে বাপী দত্তর

কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম। বিশেষণটা তার বুনো হলেও মানুষটা এমনিতে সাদাসিধে আর সরল ছিল একথা মানতেই হবে। জ্বালা যদি সে কিছু দিয়ে থাকে তাহলে পেয়েছে অনেক বেশী।

কিন্তু তারপর সেই ছাতার মালিক সুশীল চাকী! নতুন বোর্ডার নেবার সুখ সে তো হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে!

এই সব নজিরের পর আমাদের মতো ন্যাড়ার আর বেল তলায় যাওয়া উচিত?

তা ছাড়া বোর্ডার নিতে গেলাম কিনা ধনু চৌধুরীকে?

বাহাত্তর নম্বরে আমাদের ভাগীদার নেওয়াটাই আহাম্মকী হয়েছে একথা স্বীকার করবার পর অবশ্য আমাদের তরফের কিছু বলার থাকে। চোখে তো আমাদের সত্যি সে-রকম এক্সরে যন্ত্র নেই, যে বুকের হাড়-চামড়া ফুঁড়ে একেবারে ভেতরের চেহারাটা দেখিয়ে দেবে। ধনু চৌধুরীর সার্টিফিকেটগুলো বাইরে থেকে দেখলে তো সবই মিলে যায়। সেই অতি সভ্য-ভব্য ছেলে! সাত চড়ে রা নেই। যেমন আদব-কায়দা দুরস্ত তেমনি বিনয়ী। ব্যবহারে একেবারে মোহিত হতে হয়। ঘনাদাকে পর্যন্ত মোহিত করে দিয়েছে!

কিন্তু ঐ মোহিত করা যে এমন সর্বনাশা তা কি আগে ভাবতে পেরেছি। গায়ে যেন বিচুটির জ্বালা ধরিয়ে ছাড়ছে।

ওপর থেকে দোষ ধরবার কিছু নেই। প্রথম দিনই বিকেলে আমাদের আড্ডা ঘরে ভক্ত হনুমানটির মত একটি কোণে এসে বসেছে। আমাদের পাঁচজনের দয়ায় ঘনাদার একটু দর্শন পেয়ে আর বাণী শুনেই যেন ধন্য। তার স্বরূপটির একটু আঁচ পাওয়া গেছে প্লেট সাজানো ট্রে নিয়ে বনোয়ারীর ঘরে ঢোকার পরেই।

ঘনাদাকে টোপে ধরবার জন্য সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্লেটে একটি করে স্পেশ্যাল কবিরাজী কাটলেট। ঘনাদার প্লেটে অবশ্য দুটো।

প্লেটটা হাতে নিয়ে ঘনাদা যে খুশি হয়েছেন তা তাঁর রসিকতার নমুনা থেকেই বোঝা গেছে।

আ কবিরাজী কাটলেট বুঝি? তা এক সঙ্গে চরক-সুশ্রুতকেই আমদানি করেছ যে হে।

হ্যাঁ,—যথারীতি কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলেছি আমরা—স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম সকালে।

তাই নাকি!—বলে ঘনাদা সোৎসাহে স্পেশ্যাল কবিরাজীর মান রাখতে যাবেন, এমন সময়ে বিনীত গলার কুণ্ঠিত প্রশ্ন আমাদের চমকে দিয়েছে,—ঐ কাটলেট কি এঁর খাওয়া ঠিক হবে?

কাটলেট-এর টুকরো তুলতে গিয়ে ঘনাদার হাতটা মুখের কাছেই থমকে থেমে গেছে। আর আমাদের কপাল, ভুরু কুঁচকে গেছে নিজেদের কানগুলোকে বিশ্বাস করতে না পেরে?

কি বললেন? শিবু বেশ সন্দিগ্ধভাবে ধনু চৌধুরীর দিকে চেয়ে জানতে চেয়েছে।

বলছিলাম কি,—ধনু চৌধুরী যেন অতি সঙ্কোচের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করেছে,—আপনারা নিজেরা যা খান না খান, বাজারের আজেবাজে জিনিষ ওঁর না খাওয়াই ভালো নয় কি?

বাজারের আজেবাজে জিনিষ!—গৌরের স্তম্ভিত গলায় কথাগুলো যেন আটকে গেছে,—আমাদের পাড়ার কমরেড কেবিনের কবিরাজী কাটলেট আজেবাজে বাজারের জিনিষ! আপনি খেয়ে দেখেছেন কখনো?

আজ্ঞে না!—সেই বিনয়ে গলে পড়া কিন্তু-কিন্তু ভাব—দোকানের ও-সব বনস্পতিতে ভাজা জিনিষ তো খাই না, দাস বাবুরও খাওয়া বোধহয় উচিত নয়!

একে কমরেড কেবিনের কবিরাজী কাটলেটের নামে বনস্পতিতে ভাজার কলঙ্ক! তার ওপর আবার দাস বাবু!

আমাদের মুখে খানিকক্ষণ আর কথা সরেনি!

ঘনাদাই অত্যন্ত শঙ্কিত গলায় শুধু আমাদের নয়, বিশ্বসংসারকে যেন প্রশ্ন করছেন,—তাহলে কি হবে? এতো বড়ো গোলমেলে ব্যাপার দেখছি!

আমরা সভয়ে এবার ঘনাদার প্লেটের দিকে তাকিয়েছি। শেষে: তাঁর খাওয়াটাই মাটি হল নাকি এই উজবুকের তোলা ফ্যাকড়ায়?

না, তা হয়নি। ঘনাদা তাঁর প্লেটের দ্বিতীয় কাটলেটটার শেষ টুকরো মুখে দিয়েই তাঁর ও পৃথিবীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাবিত হয়ে উঠেছেন।

অনেক কষ্টে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে তাঁকে আমরা এবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি।

গোলমাল আবার কোথায়? শিশির তাঁকে সাহস দিয়েছে।

গোলমাল যদি থাকে তো কারুর মাথায় আছে!—শিবু তার সন্দেহটা জানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ওই যে শুনছি, বনস্পতি না কি!—ঘনাদা তাঁর উদ্বেগটা প্রকাশ করেছেন।

শুনলেই হল!—আমি ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছি,—কাটলেট কিসে ভাজা তা কি কারুন শুনে বুঝবেন?

কমরেড কেবিন কোনদিন ঘি ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করে!—গৌর জোর গলায় ঘোষণা করেছে।

ঘি-এ ভাজলেই ভালো। আবার সেই মোলায়েম গলার সবিনয় মন্তব্য শোনা গেছে,—কিন্তু বাজারের ঘি-ও ভেজাল কি না।

ঠিকই বলেছ! ঘনাদা চিন্তিতভাবে বনোয়ারীর নিয়ে আসা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলছেন,—খাঁটি বলে কিছু কি আর আছে! যা তা খেয়ে বেশ একটু ভাবনাই হচ্ছে তাই।

ঘনাদার ভাবনা সামলাতে হজমি-গুলি, চূরণ-জোয়ানের আরক সমেত অনেক কিছুরই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তাতেও আমাদের আসর কিন্তু আর জমানো যায়নি।

যা তা খাওয়ার ভাবনায়, শরীরটায় কেমন যেন যুৎ পাচ্ছেন না, বলে ঘনাদা তাঁর টঙেয় চলে গেছেন তাড়াতাড়ি।

ধন্নু চৌধুরীকে তখনকার মত একা পাবার সুযোগও আমাদের হয়নি। শরীর খারাপ শুনে ব্যস্ত হয়ে সে তার দাস বাবুকে উপরে

তুলে দিতে সঙ্গে গিয়েছে।

ঐ দিয়েই কলির সুরু। তারপর ধনু চৌধুরীর আদিখ্যেতায় বাহাত্তর নম্বর আমাদের কাছে বনবাস হয়ে উঠেছে।

এত বড় ভক্ত গরুড়পক্ষী ঘনাদার ছিল কে আর জানত! ঘনাদার তোয়াজ-তদ্বির ছাড়া ধনু চৌধুরীর আর কোন চিন্তাই নেই।

খেতে বসেছি এক সঙ্গে সবাই রাত্তিরে। বাপী দত্ত ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে শুক্রবারের বদলে শনিবার রাত্রের খ্যাঁটটাই একটু এলাহী হয়।

রামভুজ হয়ত পার্সের ঝালের সবচেয়ে ডাগর মাছটা ঘনাদার পাতে দিতে যাচ্ছে, হঠাৎ চমকে রামভুজের হাত থেকে মাছের গামলাটাই প্রায় পড়ে পড়ে।

চমকে উঠি আমরাও। ঘনাদাও বাদ যায় না।

আমাদের চমকিত সকলের দৃষ্টিই গিয়ে পড়ে অবশ্য একই জায়গায়। সেখানে ধনু চৌধুরী হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠেছে—আরে করছ কি ঠাকুর! ওই বড় মাছটা দাস বাবুকে দিচ্ছ?

হতবুদ্ধি রামভুজ, হতভম্ব আমরা, আর স্বয়ং ঘনাদাও কেমন ভ্যাবাচাকা। বলে কি ধনু চৌধুরী? সবচেয়ে বড় মাছটা ঘনাদাকে দেওয়া হচ্ছে বলে আপত্তি?

রামভুজ হাতের গামলার সঙ্গে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে,—হাঁ, এই সবসে বড়াঠোই তো বড়বাবুকে লিয়ে রাখিয়েছি। ইস্‌মে ডিমভি আছে!

ঐ ডিম আছে বলেই তো ভাবনা।—ধনু চৌধুরী তার বীর পূজার সঙ্গে বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা দেখায়,—ডিম থাকলেই মাছ আগে নষ্ট হয় কি না! তাই বলছি ও মাছটা দাস বাবুকে নাই দিলে। হাজার হোক সকালের মাছ তো!

আচ্ছা, যো হুকুম আপনাদের!—রামভুজ নিতান্ত অনিচ্ছায় পুরো দেড় বিঘৎ মাপের পার্সে কুলতিলকটিকে আবার গামলায় রাখতে যায়।

আমাদের বাকযন্ত্র তখনও বিকল। ঘনাদাই মৃদু একটু আপত্তির

সঙ্গে উদার আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখান,—থাক! থাক! মাছটা আর তুলে রেখে কি হবে! খেয়ে খারাপ যদি কিছু হবার হয় তো আমারই হোক। আমি থাকতে তোমাদের ত' আর বিপদে ফেলতে পারি না!

কিন্তু আমরা সব আর আপনি এক কথা হল!—ধনু চৌধুরী ভক্তির পরীক্ষায় আমাদের উপর ট্রিপিল প্রমোশন নিয়ে এগিয়ে যায় তো বটেই, সেই সঙ্গে যেভাবে আমাদের দিকে তাকায় তাতে মনে হয় বানর-সেনা হয়ে আমরা যেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকেই থামচে দিয়েছি।

এরপর এস্পার-ওস্পার একটা কিছু করে ফেলবার গোঁ হয় কি না?

বিশেষ করে সেই দিনকার ওই যজ্ঞনাশের পর।

ধনু চৌধুরী আসবার পর থেকে ঘনাদাকে একবারের জন্যেও মুখ খোলাতে তো পারি নি! সেদিন অনেক কষ্টে সলতেটা প্রায় ধরে ধরে হয়েছে। হয়েছে, বাগড়া দিয়ে জলের ছাট দেবার ধনু চৌধুরী তখন আড্ডা ঘরে নেই বলে নিশ্চয়।

কিন্তু হায় আমাদের কপাল!

সবে সলতেটা দু-একটা ফুলকি ছাড়ছে ঠিক সেই সময়েই ধনু চৌধুরীর আবির্ভাব। মুখে গভীর বেদনার ছায়া আর হাতে একটা যেন কি!

সেই বস্তুটাই ঘনাদার সামনের সেণ্টার টেবিলটায় নামিয়ে রেখে প্রায় যেন বুক-ফাটা গলায় ধনু চৌধুরী বলেছে,—দেখছেন?

আনুবীক্ষণিক কিছু নয়। একটা দেশলাইয়ের বাক্স! ঘনাদার সঙ্গে দেখতে আমরাও পেয়েছি। শুধু তার ভিতর এমন শোকাবহ কি আছে বুঝতে পারি নি।

ধনু চৌধুরী আকুল আক্ষেপে সেটা তারপর বুঝিয়ে দিতে দেরি করে নি,—আপনার ওপরের ছাদটা একটু দেখতে গেছলাম। ফাটা ছাদ তো মেরামত না করলে নয়। তার ওপর কেউ একটু ঝাঁট দেবার ব্যবস্থাও করে না। আপনার ছাদে এইসব জঞ্জাল জমে থাকে!

জমে আছে তো! তুমি বলে তাই দেখলে!—ঘনাদা জমে থাকা জঞ্জালটা দু' আঙুলে তুলে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে একটি করুণ দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়লেন। সেই দীর্ঘ-নিশ্বাসেই আমাদের ধরে-আসা আশার সলতে নিবে গেল সেদিনকার মত।

যা হয় হোক অপারেশন ধনুভঙ্গ আর সুরু না করে পারি! যেমন বেয়াড়া ব্যামো তেমনি কড়া চিকিৎসার একেবারে নিখুঁত আয়োজন সারাদিন ধরে করে রেখেছি সেদিন।

সন্ধে বেলা তাঁর সরোবর সভা বাহাত্তর নম্বরে ঢুকতে না ঢুকতেই গন্ধটা নিশ্চয় পেলেন ঘনাদা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আড্ডা ঘরে ঢুকে একেবারে চাক্ষুষই পেলেন দেখতে।

চোখ কি তখন তাঁর কপালে উঠেছে? উঠলেও আমরা আর দেখব কি করে! আমরা তখন যে যার প্লেটে দিস্তেখানেক করে হিং-এর কচুরী সামলাতে ব্যস্ত।

বসুন ঘনাদা—ওরই মধ্যে কোন রকমে যেন ভদ্রতাটুকু করবার অবসর পেল শিশির।

ঘনাদা বসলেন। জেগে আছেন না স্বপ্ন দেখছেন ঠিক করবার জন্যে নিজেকে যদি দু'বার চিমটি কেটে থাকেন তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই ঘনাদা বর্তমানে, বাহাত্তর নম্বরে তাঁকে বাদ দিয়ে এ-রকম ভোজ-সভার দৃশ্য সত্যই তো বিশ্বাসের অতীত!

একটু উসখুস্ করে ঘনাদা জিজ্ঞাসা করলেন,—ধনু গেল কোথায়?

ধনু?—এতক্ষণে আমরা মুখ তুলে চাইবার ফুরসৎ পেলাম,—এই খানেই তো ছিলেন। এসব বাজারের মাল তাঁর আবার দু'চক্ষের বিষ কি না। তাই হয়ত আপনাকে সাবধান করতে বেরিয়ে গেছেন।

আমাকে সাবধান করতে! ঘনাদার গলায় গর্জন না আর্তনাদ বোঝা শক্ত। আমাকে সাবধান কি জন্যে?

যে জন্যে সাবধান, বনোয়ারী ট্রেতে করে সেই মুহূর্তেই তা চাক্ষুষ এনে হাজির। ট্রের ওপর চার চারটি প্লেটে দু'টি করে প্রমাণ চিংড়ির কাটলেট!

বনোয়ারী অভ্যাস মত প্রথমেই একটা প্লেট ঘনাদার অর্দ্ধেক বাড়ানো হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল। আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠলাম সমস্বরে,—আরে করছিস কি ? ঘনাদাকে ওই আজেবাজে জিনিষ !

শিশির অপরাধীর মত সভয়ে প্লেটটা ঘনাদার মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রায় গলবস্ত্র হয়ে বললে—মাপ করবেন ঘনাদা। এ-সব যে আপনার বারণ তা বনোয়ারী আর কি করে জানবে।

হুঁ ! ঘনাদার নয় যেন একটা সদ্য জাগা আগ্নেয়গিরির ভেতরের গোমরানি শোনা গেল।

ঘনাদা তখন আরাম কেদারা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মূর্তিমান প্রভুভক্তি শ্রীমান ধনু চৌধুরীর প্রবেশ।

কিন্তু কই ? যা ভেবে রেখেছিলাম তা হল কোথায় ? আমাদের অত তোড়জোড়ই তো মিথ্যে ! অগ্নেয়গিরির গুরু গুরু ধ্বনিই শুনলাম, তা ফেটে আগুনের হল্কা আর ছুটল না !

ধনু চৌধুরী অক্ষত শরীরে আড্ডা ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে আমাদের প্লেটগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে যেন শিউরে উঠল।

এইসব আপনারা দাস বাবুকে খাওয়ালেন ?—ধনু চৌধুরী বুঝি কেঁদেই ফেলে।

আমাদের কিছু বলতে হল না। আমাদের হয়ে ধনু চৌধুরীর দাস বাবুই জবাব দিলেন,—না। কেমন করে খাওয়াবে ? তুমি না বারণ করে গেছ !

একি ঘনাদার গলা ! আমাদেরই দু'বার তাঁর দিকে তাকাতে হল। একসঙ্গে স্নেহ, প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতা উথলে-ওঠা এমন গলা তো আমাদের শোনার ভাগ্য কখনো হয় নি।

ধনু চৌধুরী তখন কৃতার্থ হয়ে সলজ্জ একটু হাসি হাসছে,—আজ্ঞে আপনার জন্যে যেটুকু পারি না করলে এখানে আছি কেন ?

হ্যাঁ তাইতো দুঃখ হচ্ছে আরো বেশী ! ঘনাদা একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার তাঁর কেদারায় গা ঢাললেন,—তোমার মত মানুষের দেখা যখন পেলাম তখনই আবার ডেরা তুলতে হবে !

ডেরা তুলতে হবে! শুনেই আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা। কঠিন চিকিচ্ছে করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হল না কি? আগাছা নিড়োতে ফসলই সাবাড় করলাম!

ডেরা তোলার কথা কি বললেন যেন?—নেহাৎ সহজভাবে হাল্কা সুরে বলার ভান করলাম! কিন্তু গলার কাঁপুনি যাবে কোথায়?

কিন্তু কাকে কি বলছি! আমরা যে ঘরে আছি তাই যেন ভুলে গিয়ে ঘনাদা তখন তার ভক্ত প্রবরকে নিয়ে ব্যস্ত।

উদাস সুরে তাকে জানালেন,—এখানে থেকে তোমাদের বিপদ বাধাতে তো আর পারি না!

কেন? আমাদের বিপদ কেন? এবার ধনু চৌধুরী উদ্বিগ্ন।

কেন এখনো বুঝতে পারোনি? ঘনাদা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন,—সেদিন আমার ছাদে গিয়ে কি পেয়েছিলে?

ছাদে পেয়েছিলাম?—ধনু প্রথমটা একটু ভাবিত।

দেশলাই-এর বাক্স।—ধনুর স্মরণ শক্তি একটু উস্কে দিতে হল।

হ্যাঁ হ্যাঁ দেশলাইয়ের একটা খালি বাক্স! ধনু সবিস্ময়ে জানালে,—সে তো আপনাকে দেখালাম।

হ্যাঁ দেখিয়েছ—ঘনাদা দুঃখের সঙ্গে বললেন—শুধু খালি বাক্সটা। তার ভেতর কি ছিল তা তো জানো না।

ভেতরে মানে,—ধনু একটু হতভম্ব—ছিল তো দেশলাইয়ের কাঠি।

হুঁ—ঘনাদা তাঁর পেটেণ্ট নাসিকা ধ্বনি করলেন—এক হিসেবে দেশলাইয়ের কাঠিই বটে তবে সাক্ষাত শমনের হাতে তৈরী। মাপে আধ ইঞ্চিও হবে না, কিন্তু একটু ছোঁয়ালে নখের ডগা থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে যাবে।

হাওয়া বুঝে আমরা বোবা হয়ে থাকাই উচিত বুঝেছি। ধনু চৌধুরীই সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি ছিল তাহলে ও বাক্সে?

লক্সোসেলেস রেকলুস! ঘনাদা তার ক্ষুদে বোমাটি ছাড়লেন।

আমাদের মত ঘাগীরাই এবার কাৎ। ধনু চৌধুরীর অবস্থা আরো

কাহিল। সামলে ওঠবার আগেই ঘনাদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে—এ ক'দিনের মধ্যে কোথাও কিছু কামড়ায়-টামড়ায় নি তো?

এ ক'দিনে?—ধনুর মুখ প্রায় ফ্যাকাশে।—না, কামড়াবে আবার কি! ওই কালো একটা বিষ পিঁপড়ে—

বিষ পিঁপড়ে!—ধনুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঘনাদা প্রথমটা অস্থির হয়ে উঠলেন—বিষ পিঁপড়ে—ঠিক দেখেছ তো, ভুল হয় নি তো কিছু?

না, ভুল কেন হবে!—ধনু এবার দিশাহারা—বিষ পিঁপড়েই তো দেখলাম।

হ্যাঁ, বিষ পিঁপড়েই হবে। ঘনাদা এতক্ষণে ভেবেচিন্তে আশ্বস্ত হলেন,—তা না হলে এতক্ষণে আর দেখতে হতো না। জ্বর, বমি, পেটের অসহ্য কামড় তো সুরু হয়ে যেতই। তারপর কামড়ের জায়গায় ঘা থেকে গ্যাংগ্রীণ হতেই বা কতক্ষণ। হয় একেবারে কেটে বাদ কি চামড়া বদল ছাড়া সারাবার কোন উপায় নেই।

এ-সব হতো ওই আপনার কি বললেন লক্লকে কিসের কামড়ে?—ধনু চৌধুরীর গলায় দু'আনা অবিশ্বাসের সঙ্গে চৌদ্দ আনা আতঙ্ক।

লক্লকে কি নয়, লক্সোসেলেস রেকলুস।—ঘনাদা এবার ব্যাখ্যা করলেন, নেহাৎ ক্ষুদে একরকম মাকড়সা, মাপে আধ ইঞ্চি কিন্তু বিষ একেবারে সর্ব্বনাশা, আলোয় দেখা দেয় না। কোণে-কানাচে, কাপড়-জামার ভাঁজে ছায়া-ছায়ায় লুকিয়ে থাকে। সহজে ধরাও যায় না।

কিন্তু আমাদের দেশে তো এমন মাকড়সা নেই। এ সর্ব্বনাশা তাহলে আসবে কোথা থেকে?—ধনু চৌধুরীর শেষ আশার কুটো ধরবার চেষ্টা।

আসবে ওই দেশলাইয়ের বাক্সে আর পাঠাবে টেক্সাসের সেই লুই মার্ডেন যাকে শয়তানির জন্য একবার আড়ংধোলাই দিয়েছিলাম।

মনে পড়েছে মার্ডেনের কথা ?

শেষ প্রশ্নটা আমাদের প্রতি। ঘনাদার কৃপা দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়া মাত্র কি চটপট যে আমাদের স্মরণশক্তি সাফ হয়ে গেল! গৌরই আমাদের হয়ে তার লক্ষণের ফল-ধরে—রাখার মত না ছোঁয়া পুরো প্লেটটা ঘনাদার দিকে যেন তুলে বাড়িয়ে দিয়ে উৎসাহে মুখর হয়ে উঠল,—মার্ডেনের কথা আর মনে নেই! সেই যে আপনার কাছে প্রায় কীচক বধ হয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল একদিন আপনাকে দেখে নেবেই। সেই তাহলে এতদিন বাদে ঠিকানা পেয়ে এই শোধ নেবার ব্যবস্থা করেছে ?

হ্যাঁ – ঘনাদা অন্যমনস্কভাবে চিংড়ির কাটলেটে কামড় দিয়ে ফেলে হতাশভাবে বললেন,—তাই এ ডেরা আমার ছাড়তেই হবে। একটা দেশলাই-এর বাক্স পাঠিয়ে সে তো আর থামবে না। এরপর কিলবিল করবে এ বাড়িতে লক্সোসেলেস রেকলুস! সে বিপদে তোমাদের কি বলে ফেলব! এখনও তোমরা কিন্তু সাবধানে থাকবে। ক্ষুদে শয়তানগুলো কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে!......

না, ঘনাদাকে বাহাত্তর নম্বর ছাড়তে হয় নি। তার বদলে ধনু চৌধুরী হঠাৎ দু'দিন বাদে পাওনা-টাওনা চুকিয়ে হঠাৎ বিদেয় নিয়ে গিয়েছে।

ধনুর্ভঙ্গটা সুতরাং ঘনাদার—ই।

———